# [illegible] চট্টোপাধ্যায়





## বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

# ৺ মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়







কম্বিদেশ

বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠান

পোঃ তাঁতিপাড়া।  জেলাঃ বীরভূম।

সৌজন্যে ঃ—

শ্রীযুক্ত বলাই কৃষ্ণ রায়

আরামবাগ, হুগলি

মূল্য ঃ- পনের টাকা মাত্র

[ সংগৃহীত স্বেচ্ছা মূল্য বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কাজে ব্যবহৃত হইবে ]

মুদ্রণে ঃ—

দেবেশ চক্রবর্ত্তী

প্রিন্ট ইণ্ডিয়া

কলিকাতা-৬

স্বাধীনতা সংগ্রামী, সর্ব্বত্যাগী, সাহসী, দেশ প্রেমিক ও সমাজসেবক মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে দেশের ও সমাজের যে ক্ষতি হ'য়েছে তা অপূরণীয়। মিহির বাবু ছিলেন গান্ধজীর আদর্শে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। প্রয়াত ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি গান্ধীজীর প্রিয় ও নির্ভীক কর্মিদের সঙ্গে মিহির বাবু অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যেক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। স্বাধীনতার পর সংবিধান রচনায় Constituent assembly-র সদস্য হন এবং বিধান সভারও ( পঃ বঙ্গে ) সদস্য রূপে আদর্শ মেনে কাজ করেন। আমার চেয়ে তিন বছরের কনিষ্ঠ হলেও আমি মিহির বাবুর দেশপ্রেম, কর্ম নিষ্ঠায় ও ত্যাগে মুগ্ধ। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে আত্মীয়স্বজন, কর্মবন্ধু, সহযোগীদের এবং দেশবাসীর আদর্শনিষ্ঠ সবাইকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। ভগবান মিহির বাবুর আত্মার কল্যাণ করবেন। যুব ও ছাত্ররা মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শের অনুপ্রানিত হ'য়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণে ব্রতীহবে আশাকরি। আজ দেশের চরম দুর্দ্দিনে চাই সাহসী আদর্শ নিষ্ঠ কর্মিদের এবং তা হলেই মিহির বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

## ॥ কথারম্ভ ॥

বীরভূম জেলার অসংখ্য গ্রামের মত একটি ছোট জনবসত যার নাম তাঁতিপাড়া। অথচ এই গ্রাম, একদিন এক মহান মানুষের চেষ্টায় সাধনায় আজ কেবল মাত্র জেলাতে নয়, তার ব্যাপক তসর শিল্প চর্চায় বিশ্বের অনেক দেশে পরিচিত। সেই মানুষটি যাঁকে আপনারা জনসাধারণ 'বাবু' বলে ডাকতো, জানতো তাঁর জীবন কাহিনী মানব মহিমার একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা। আমরা সেই মানুষটি জীবন ঘটনা ও বীরভূম জেলাবাসীর কাছে তাঁর অবদান, বিশেষ করে তাঁতিপাড়া ও তৎসংলগ্ন আরো অনেক গ্রামগুলি অসংখ্য গুণগ্রাহীর কাছে নিবেদন করতে চাই। তিনি ইহজগতের চেহারায় আর নেই কিন্তু তিনি আছেন, সামাজিক রাষ্ট্রীক এবং আত্মিক অনেক বন্ধন মুক্তির দিশারী হয়ে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী, গান্ধীবাদী নেতা, বীরভূম বন্ধু, অকৃতদার ও আত্মোৎসর্গকারী মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রচলিত কথা, 'জন্ম হউক যথা তথা/কর্ম হউক ভাল' অত্যন্ত সারগর্ভ। এই যে 'কর্ম হউক ভাল'—ভাল কাজ যার একমাত্র সংজ্ঞা মানুষের মুক্তির জন্যে, উন্নতি জন্যে, যা কিছু। এই রকম কাজে রত হয়ে মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় যেখানে তাঁর দীর্ঘ উনপঞ্চাশটি বছর কাটিয়েছেন সে জায়গা হল এই তাঁতিপাড়া। তিনি এখানে এসেছিলেন ১৯৩৭ সালের একটা টালমটাল দিনে। এ গ্রামের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের। ইংরেজ শাসনে দুশো বছরের দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে ভারতের মানুষ মরিয়া হয়ে ঘা মারছে। আর মাত্র দশটা বছর বাকী স্বাধীনতার দরজা খুলতে। এই উত্তাল সময়ে তিনি এসে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে এমনভাবে মিশলেন যে কোনো ফারাক রইল না। তাঁরও মেটেবাড়ী, খড়ো চাল, তাঁর বিছানা ও অতি সহজসরল সেই সঙ্গে সন্ন্যাসীর জীবন। এই মানুষটির দীর্ঘ পঁচাশি বছরের জীবনকাহিনীর সব পাতাগুলি আমাদের জানা নেই, অনেক তার হলুদ আবছায়ায় ধুলোগুঁড়ো হয়ে উড়ে গেছে। তবু যা কিছু আছে এ অঞ্চলের বহু ব্যক্তির স্মৃতিতে সেগুলি গেঁথে তাঁর একটা জীবনকাহিনী রচনার প্রয়াস আমাদের। এর পেছনে কাজ করছে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ তাঁর আদর্শ-চিন্তা ও সর্বোপরী মানব প্রেম। তিনি যথার্থই মানুষকে ভালবাসতেন। এই তাঁতিপাড়ার যে কোনো জায়গায় পথে, ঘরে অতি বিশ্বস্ত চোখে দেখে নেওয়া যেতে পারে তিনি অতি আন্তরিকতায় জড়িয়ে ধরেছেন সদ্য মাঠ থেকে উঠে আসা জলকাদা মাখা চাষীকে, তেলকালির শ্রমিককে। আবার উচ্চ পর্যায়ে সরকরী কর্মচারীদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রধানদের একই ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। এই যে মানুষটি সদা হাস্যময়, আত্মপরতা শূন্য যিনি বাস্তবে উপস্থিত থেকে মানবকল্যাণের একটি কেন্দ্র তাঁতিপাড়াকে বেছে নিয়েছিলেন আমরা সেখানে মানুষ হিসেবে তাঁর স্মৃতিতর্পণের জন্যে এই রকম এক পুস্তক নির্মাণে ব্রতী হয়েছি। অনেকাংশে শ্রুতিনির্ভর ও কিছু কিছু তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ শ্রবণ নির্ভরতাই

আমাদের উপাদান। সেই উপাদানগুলির বিন্যাসে আমরা মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়-এর এক জীবনী গ্রন্থ রচনা করতে চেষ্টা করেছি। এর উদ্দেশ্য, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্যে একটি জীবনের কথা তুলে রাখা যে জীবন যথার্থ ভাবে মানুষ ছিল। তাই জীবনী ভিত্তিক এই গ্রন্থে সেই মানুষটির ব্যক্তিত্ব, বিশালতা ও অন্যদিকে মানব প্রেমে বিগলিত ঘটনাগুলিই আমাদের উপজীব্য হয়েছে।

পরিশেষে নিবেদন, আমাদের পরিবেশনে যদি কোনো তথ্য ও তত্ত্বগত ভুল থাকে আমরা তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের আশা এই গ্রন্থটির থেকে উঠে আসা মানুষটির স্মৃতিই আমাদের কর্মশক্তি, প্রেরণা ও ভবিষ্যৎ আশা।

---





বিংশ শতাব্দী সবে শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষে তখন বৃটিশের পূর্ণ আধিপত্য। শাসনের অজুহাতে চলেছে অবাধ শোষন। উৎপীড়িত দেশবাসীর অন্তরে বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ গুমরে উঠলেও নানান্ প্রতিবন্ধকতার জন্যে তখনো ঠিক সোচ্চার হতে পারছে না। এহেন সময়ে ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বাড়ীর অন্তঃপুরে আবির্ভাব হলো এক নব জাতকের। বেজে উঠলো শংখ। বামাকণ্ঠে উলুধ্বনি প্রতিবেশীদের জানান দিলো শুভবার্তা। দেবালয়ে গেল নৈবেদ্য নবজাতকের কল্যান কামনায়। অগ্রান সংক্রান্তিতে ইতুপূজার দিন রবিবারে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্যে জাতকের নাম রাখা হলো মিহির।

দিনে দিনে বড় হতে থাকলেন মিহির। বাড়ীতে তখন দুটি মাত্র শিশু, জ্যেষ্ঠ বিজয়লাল, কনিষ্ঠ মিহিরলাল। বাবা-মা-ঠাকুমা—শিশুদের আদর যত্নে কেউই এতটুকু কম যান না। পরিচ্ছন্ন সম্পন্ন সুখী পরিবার। মানুষ হওয়ার অনুকূল পরিবেশে মানুষ হতে লাগলেন মিহির।

কৃষ্ণনগর শহরের যে পাড়ায় কিশোরীবাবুর বাস, সেই পাড়াতেই কেদার মাষ্টারের পাঠশালা। কেদার মাষ্টার কিশোরীবাবুর পরিচিত মানুষ। কিশোরীবাবুর কনিষ্ঠ সন্তান মিহিরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হাতে খড়ির অনেক আগে থেকে তাঁর পাঠশালায় যেতে লাগলেন মিহির, দাদা বিজয়ের সঙ্গে। পাঠশালায় যেতে তাঁর ভালো লাগতো। বিজয় কিন্তু ভাইকে সঙ্গে নেবেন না, শিশুমনের খেয়াল আর কি। এদিকে মিহিরের জেদ, তিনি কিছুতেই দাদার সঙ্গ ছাড়বেন না। এই নিয়ে পিঠোপিঠি দুভায়ের নিত্যদ্বন্দ্ব দেখতে পেতেন অনেকেই, দেখে আনন্দ পেতেন।

কেদার মাষ্টারের পাঠশালায় তাঁর কাছেই প্রথম পাঠ নিলেন শিশু মিহির। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়ে শেষ হলো। গড়ে উঠলো বাংলা ভাষা ও বানানের বনিয়াদ।

প্রাইমারি পাশ করার পর স্থানীয় এম. ই. স্কুলে ভর্তি হলেন মিহির। এখানে পেলেন ডাবল প্রমোশন।

কী পড়াশুনোয়, কী খেলাধূলা এবং অন্যান্য দিকে সে সময়ে সি. এম. এস. হাইস্কুল ছিলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আদর্শস্থানীয়। প্রিন্সিপ্যাল ই. টি. নক্স্ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। খৃষ্টান হলেও তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু, শিক্ষানুরাগী, শিশুর দেহমনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে যথার্থ আগ্রহী। অন্যান্য শিক্ষক মশায়রাও ছিলেন ছাত্রদের প্রতি সমান সহানুভূতিশীল। প্রতিটি ছাত্রের উপর ছিলো তাঁদের সমান দৃষ্টি। যত শাসন তত সোহাগ, পুরস্কার তিরস্কার ছিলো সমানুপাতিক।

এই স্কুলেই সিকস্থ্ ক্লাসে ভর্তি করা হলো মিহিরকে। এখানেও সঙ্গী হলেন তাঁর দাদা বিজয়লাল। ভাইকে সঙ্গে নেওয়ার সেই আগের মত অনিচ্ছা আর নেই, সুতরাং পুরানো সে দ্বন্দ্বও এখন আর নেই।

ইংরেজ আমলের ইংরেজী স্কুলে পড়তে পড়তে মেধাবী মিহির শিখলেন ইংরেজী উচ্চারন। শ্রুতিলিপি

আনলো গুনে লেখায় দক্ষতা। বাংলা ইংরেজী ক্লাসে দুলাইন করে হাতের লেখা ছিলো বাধ্যতামূলক। ফলে হস্তাক্ষর হলো সুন্দরতর।

পড়াশুনো ছাড়াও স্কুলে শেখানো হতো খেলাধূলো এবং সেই সঙ্গে ফার্স্ট এড্ বা প্রাথমিক চিকিৎসা। প্রিন্সিপ্যাল নক্স ছিলেন খেলায় উৎসাহী—ফুটবল ক্রিকেট হকি টেনিস ব্যাডমিন্টন সব খেলাই চালু করেছিলেন তিনি স্কুলে, চালু করেছিলেন বয় স্কাউট ট্রেনিং। ইচ্ছানুযায়ী খেলায় অংশ নিতেন মিহির, শিখতেন প্রাথমিক চিকিৎসা; স্কাউট ট্রেনিং ও তাঁর বাদ যায় নি। বিলেত থেকে আনান পরিচ্ছদ পরে সে কী আনন্দ; কী অদ্ভুত সে সব দিনের অনুভূতি।

এই ভাবে পড়াশুনো এবং খেলাধুলো চললো পাশাপাশি। শেখা হলো আর ও অনেক কিছু। নম্রতা, ভদ্রতা শৃঙ্খলা সত্যানুরাগ, সময়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা স্বনির্ভরতা। এক কথায় বিদ্যালয় পরিবেশ দেহ এবং মনের দিক দিয়ে অনেকখানি তৈরী করে ছিল ভাবি দিনের মিহিরবাবুকে তাঁর অজান্তে।

অবশ্য এ স্বীকৃতি মিহিরবাবু নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন—আমার জীবন শিক্ষকদের হাতে গড়া। একদিন যে পথে নেমেছিলাম, ভাল শিক্ষকের কাছে না পড়লে এতদিন এ পথে টিকে থাকতে পারতাম না। অনেকে সাময়িক উন্মাদনায় এ পথে এসে শেষ পর্যন্ত আপন আপন স্বভাবে ফিরে গেছে। কিন্তু আমি এই ভাবেই এক এক করে পঁচাশি বছর কাটিয়ে দিলাম, সে শুধু আমার মাষ্টার মশায়দের আশির্বাদ।

দিন, মাস, এক এক করে পাঁচ পাঁচটি বছর কেটে গেল। ফার্স্ট ক্লাসে উঠলেন মিহির। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবেন। তবু দুষ্টুবুদ্ধি মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দেয়। বাড়ীতে আটভাইবোনে যত ভাব, মার কোলের কাছের জায়গাটির দখল স্বত্ব নিয়ে পরস্পরে তত আড়াআড়ি। বয়স কম বলে ছেলেমানুষি তখনো যায়নি। সেই রকমই একটা ঘটনা ঘটলো সেবার স্কুলে।

তখন হেডমাষ্টার মনোরঞ্জন রায় চৌধুরীর স্থানে নতুন এসেছেন নগেন্দ্রনাথ মজুমদার। থাকেন স্কুল কম-পাউণ্ডেই। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরীর জন্য ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেদের কাছে একখানা বই চেয়ে পাঠালেন তিনি। ছেলেরা কিন্তু ঠিক করলো বই দেবে না, তাদের বক্তব্য: বই-এর দরকার থাকলে মাষ্টারমশায় লাইব্রেরী থেকে নেবেন। পরের দিন ক্লাসে এসে মাষ্টারমশায় বই না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে ছেলেরা ঐ কথাই বললো। মাষ্টারমশায় বললেন, লাইব্রেরীর বই আমি নেব না। তোমাদের কাছে আমি বই চেয়েছি তোমাদের কাছেই নেব। দেবে কি না?

সমস্ত ক্লাস নীরব। কেউ কোন জবাব দেয় না দেখে মাষ্টারমশায় ধরলেন মিহিরকে, বললেন, কি মিহির, বই দেবে কি না?

উঠে দাঁড়ালেন মিহির, বললেন, দেব স্যার।

—আন তাহলে।

—বই আজ আনিনি স্যার।

আনতে হবে। যদি বলেন—

মাষ্টারমশায়ের অনুমতি নিয়ে বাড়ী গেলেন মিহির প্রায় ছুটতে ছুটতে। ফিরে এসে দেখেন ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। মাষ্টারমশায় চলে গেছেন।

ছুটির পর মাষ্টারমশায়ের বাসায় গেলেন মিহির। আশা ছিলো, বাড়ী গিয়ে বই দিলে মাষ্টারমশায় খুশী হয়ে



"বাঃ বাহাদুর ছেলে" বলে তাঁর পিঠ চাপড়ে দেবেন। কিন্তু বিধিবাম। বই হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন মাষ্টারমশায়, কাল দাওনি কেন? কী হয়েছিলো?

এতো বাহবা দেওয়া নয়, এযে সরাসরি কৈফিয়ৎ দাবী এজন্যেই বুঝি মাষ্টারমশায়ের বাড়ী আসা। মনে মনে আহত হলেন মিহির। আস্তে আস্তে বললেন,

—আমি স্যার

—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি স্যার

—ভাবলাম

—কি ভাবলে?

—আপনি বোধ হয়—

—আমি বোধ হয়?

—লাইব্রেরি থেকে—

কথা শেষ হলো না মিহিরের। পিলে শুদ্ধু চমকে উঠলো মাষ্টারমশায়ের ধমকে। "থামো! খুব দুষ্টুমি শিখেছো না? লাইব্রেরী! স্কুল লাইব্রেরী কি শুধু আমার জন্যে? অন্য মাষ্টারমশায়রা নেই! তাঁদের বই এর দরকার হয় না!"

দুরু দুরু বুকে, ছল ছল চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন মিহির। একটু নীচু গলায় এবার মাষ্টারমশায় বললেন, যাও, এরকম আর কখ্খনো করবে না।

এবার মাথা তুলে মাষ্টারমশায়ের দিকে একবার তাকিয়ে আবার মাথা নামালেন মিহির। বললেন, "Is that the behaviour that I am to expect from you, Sir?" কথা কটি মুখস্থ বলার মত বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিহির। মাষ্টার মশায়ের মনের উপর কথাগুলোর কী প্রতিক্রিয়া হলো এবং কীভাবে তা তাঁর মুখের উপর প্রতিফলিত হলো, সে সব দেখার মত ধৈর্য তাঁর ছিল না। কি বলতে গিয়ে কি বলে এলেন, তা সেদিন বুঝতে পারলেন না, বুঝতে পারলেন পরের দিন যখন ইংরেজীর ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকার হুকুম হলো। ইংরেজী বলতে গিয়ে তিনি গতকাল মস্ত ভুল করে এসেছেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন—আপনার কাছে এরকম ব্যবহার স্যার আশা করিনি। অথচ বলেছেন, আপনার কাছ থেকে এরকম ব্যবহারই কি আমাকে আশা করতে হবে স্যার, সোজা কথায় আপনার কাছে কি স্যার এমনি ব্যবহারই পাবো? কোন একটা বিশেষ কারনে, কোন একটা বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ের আচরন নয়, মাষ্টারমশায়ের অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সমস্ত আচরনের উপর কটাক্ষপাত করেছেন মিহির। নতুন শেখা ইংরেজী ফলাতে গিয়েই মস্ত ভুল হয়ে গেছে এবং সে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে তিন দিনে তিনটি পিরিয়ডে টায় দাঁড়িয়ে থেকে।

আবার সেই রকম ঘটনা ঘটলো আর একদিন। ছেলেদের কয়েকজনের মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি গজালো, আম খেতে যাবে। দলবল মিলে সবাই চললো আমগাছের দিকে। মিহিরও চললেন এদের একজন হয়ে।

স্কুলের কাছেই কাঁচামিঠে আমের গাছ। গাছ রক্ষকের নাম উত্তম। ছেলেরা তাকে খেপাতো তার নামে ছড়া কেটে কেটে সুর করে টেনে টেনে বলতো, উত্তম—মধ্যম, চাপদাড়িতে আলুর দম। রেগে টং হয়ে যেতো উত্তম, আর ছেলেদের ততই মজা লাগতো।

আম পাড়তে লাগলো ছেলেরা গাছতলায় গিয়ে। দেখতে পেয়ে উত্তম হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এলো। তাকে আসতে দেখে সব্বাই দে ছুট। যে যেদিকে পারলো পালালো। কেবল মিহিরই পড়ে গেলেন উত্তমের নজরে।

পরের দিন উত্তম মিহিরের নামে নালিশ করালো হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে। তলব করা হলো মিহিরকে, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেন মিহির। শাস্তি ঘোষিত হলো : ছুটির পর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী যাওয়া চলবে না, কুড়ি লাইন লিখে দিলে তবে ছুটি।

ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা যে যার বাড়ী চলে গেল। মাষ্টার মশায়রাও চলে গেলেন। কারো সাড়াশব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না। শূন্য ক্লাস ঘরের এক কোনে ডেস্কের আড়ালে বসে মিহির একা মন ভার ভার, বুকের মধ্যে আড়াইমনি একটা পাথর যেন চেপে বসে আছে। দুঃখে অভিমানে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। চোখে জল এসে দৃষ্টি করে দিচ্ছে ঝাপসা।

বেশ খানিকক্ষন চুপ করে বসে থাকলেন মিহির। তারপর খাতা খুলে লিখতে শুরু করলেন তিনি। লিখতে লিখতে হঠাৎ খেয়াল হলো মাথার উপর টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে, এক ফোঁটা, তারপর এক ফোঁটা, তারপর আবার এক ফোঁটা। চোখ তুলে উপরের দিকে তাকাতেই দেখলেন পেছনে কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং হেডমাষ্টার মশায়, তাঁর দুটি চোখ থেকে দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে দুটি জলের ধারা।

মুহূর্তে যেন ভূমিকম্প ঘটে গেল মিহিরের অন্তর রাজ্যে। হাঁও হাঁও করে কাঁদতে লাগলেন তিনি। মাষ্টারমশায় কত চেষ্টা করলেন তাঁকে শান্ত করার, গায়ে মাথায় হাত বুলোলেন, কত আদর করলেন, বাইরের মাঠে বেড়াতে বেড়াতে কত কথা বললেন। তারপর মিহিরকে বাড়ীর পথ ধরিয়ে দিয়ে নিজে ফিরে গেলেন বাসায়।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুদিনের এই দুটি ঘটনার বিশ্লেষণ করেছিলেন মিহির। 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্ব শ্রেষ্ঠ সে বিচার'—কথাটা যে কতখানি সত্যি তার চাক্ষুষ প্রমান সেদিন পেয়েছিলেন তিনি। বুঝেছিলেন 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে'।

"বড়ো হওয়ার বড়ো বিড়ম্বনা, বুঝলে! রোদ জল ঝড়ের যতো দাপট সব বড় গাছকেই সামলাতে হয়, ছোট গাছ সেদিক দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমার ভাগ্যটাই এমন যে আমার বেলা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এর উল্টোটা ফলতো। দুষ্টুমি করে মুনাফা লুটবার সময় সবাই থাকতো, কিন্তু ধরা পড়লে লাঞ্ছনার সবটুকুই জুটতো আমার কপালে। আমার অপরাধ, বয়সে আমি ছিলাম সব থেকে ছোট।"—নিজের বাল্যজীবনের কথা প্রসঙ্গে হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন মিহিরবাবু। অবশ্য ব্যাপারগুলোও ঘটেছিল অনেকটা সেই রকমই। নইলে ক্লাসে এত ছেলে থাকতে হেডমাষ্টার মশায় মিহিরকেই বই চেয়ে বসলেন কেন? আম খাওয়ার জন্য সবাইকে ছেড়ে উত্তম শুধু মিহিরের নামেই বা নালিশ করবে কেন? কারন মিহির ছোট, বয়সে কম। আবার বয়স কম বলেই ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসবার পুরো প্রস্তুতি থাকলেও ফার্স্টক্লাসের ছাত্র মিহিরকে সেবার আটকে দেওয়া হলো।

সে বছর ফাইন্যাল দেওয়ার সুযোগ হারিয়ে যতখানি আফশোষ, পরের বছর হারানো সুযোগ ফিরে পেয়ে ঠিক ততখানি আনন্দ। নতুন উদ্যমে তৈরী হতে লাগলেন মিহির ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্যে। কিন্তু এবারেও এলো বিপত্তি, একবারে মাঝপথে। না, মনুষ্যসৃষ্ট কোন বাধা নয়, এ যেন সম্পূর্ণ বিধিলিপি। হঠাৎ কালাজ্বরে মিহির হলেন শয্যাশায়ী। এত চিকিৎসা, এত ওষুধ পত্র, এত সেবাযত্ন, তবু জ্বর ছাড়তে চায় না কিছুতেই। রোগীর



অবস্থা দিনের দিন একটু একটু করে এগেয়ে চলে সংকটের দিকে। রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে মিহির দেখতে পান বাবা-মার চোখে মুখে সংশয়ের ছায়া। পাশের ঘরে থেকে কানে আসে বাবার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অসহায় আক্ষেপ : ছেলেটাকে বোধ হয় আর ফিরে পাওয়া যাবে না। শোনা যায় মারও চাপা কান্নার আওয়াজ। সন্তানের সংকটে বাবা-মার মনের অবস্থা বুঝতে পারেন মিহির। কাঁদেন তিনিও।

এ অবস্থাতেই হঠাৎ একদিন ঝোঁক নিলেন মিহির—আমি পড়বো, পরীক্ষা দেব, বইগুলো আমার হাতের কাছে রেখে দাও। ছেলের কথা শুনে মা তো হতভম্ব, কিশোরীবাবুও অবাক। ছেলে বলে কি! এ অবস্থায়—না না এ হতে পারে না।

শুনে কাঁদতে লাগলেন মিহির। সে কান্না থামতেই চায় না। প্রমাদ গুনলেন কিশোরীবাবু। হা ঈশ্বর, এ আবার কী নতুন উপসর্গ!

যাই হোক, পুত্রকে সাময়িক আশ্বাস দিয়ে দেখা করলেন মিহিরের স্কুলের মাষ্টারমশায়দের সঙ্গে। মিহিরের অসুখে তাঁরাও চিন্তিত। পারস্পরিক আলোচনার পর স্থির হল : বর্তমান অবস্থায় মিহিরকে নিজে পড়তে দেওয়া চলবে না, পড়ার বিষয় তাঁকে পড়ে শুনিয়ে দিতে হবে। কেবলমাত্র অঙ্কের বেলা কষা উদাহরনগুলোয় চোখ বুলোবেন মিহির অবসর সময়ে। কিশোরীবাবুর অনুরোধে স্কুলের শিক্ষক শ্রীগুনীন্দ্র কুমার ঘোষ মশায় স্কুলের ছুটির পর তাঁর বাড়ী গিয়ে পড়ার বিষয় মিহিরকে পড়ে শুনিয়ে আসার দায়িত্ব নিলেন।

সন্তুষ্ট হলেন মিহির এ ব্যবস্থায়। এইভাবে একদিকে চললো রোগের চিকিৎসা, অন্যদিকে চললো পরীক্ষার প্রস্তুতি।

জ্বর কিন্তু ছাড়ে না। একমাত্র সোডিয়াম এন্টিমোনি টার্টারেট ছাড়া কালাজ্বরের অন্য কোন ওষুধ তখনকার দিনে ছিলো না। দেখে শুনে প্রিন্সিপ্যাল নকস্ সাহেব একদিন কালনার এক সাহেব বিশেষজ্ঞের কথা বললেন, যোগাযোগের জন্য চিঠিও লিখে দিলেন একখানা। পত্র নিয়ে কিশোরীবাবু দেখা করলেন কালনায় ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারবাবু এত দুর্বল রোগীকে কালনায় না এনে রানাঘাটে দয়াবাড়ী মিশনে আমেরিকার একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কালনার ডাক্তারের পত্র নিয়ে কিশোরীবাবু গেলেন রানাঘাট। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আনলেন প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র।

একটু সুস্থ বোধ করলেন মিহির, কিন্তু জ্বর একটু লেগেই থাকলো। এদিকে পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। ছেলের যা জেদ তাতে পরীক্ষায় তাঁকে বসাতেই হবে। অথচ জ্বর না ছাড়লে—"কলকাতায় একবার দেখালে হয় না!" বললেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক ভবেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অবশ্য একটু ইতস্ততঃ করে, কারণ বড়ো বড়ো ডাক্তাররা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে ভবেশবাবুর প্রস্তাব কি মনঃপুত হবে!

কোলকাতায়!—কোথায়! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কিশোরীবাবু।

"কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন মশায়কে।" বললেন ভবেশবাবু।

মিহিরের আরোগ্যের জন্যে যে যা বলেছে তাই করেছেন কিশোরীবাবু। এ প্রস্তাবেও রাজী হলেন।

সুরু হলো কবিরাজী চিকিৎসা। কয়েকটি বিশেষ অনুপান সহযোগে 'জয়মঙ্গল রস' সেবন করতে দিলেন কবিরাজ মশায়।

জ্বরের প্রথম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় সাত সাতটা মাস কেটে গেছে। পরীক্ষার দিনও দেখতে দেখতে

এসে গেল। একে দীর্ঘদিন রোগভোগে দুর্বল, তার ওপর জ্বর তখনো ছাড়েনি। সুতরাং বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন মিহির। শেষ পরীক্ষা দিয়ে তিনি খুব খুসী।

এদিকে জয়মঙ্গল রসের গুনেই হোক অথবা মানসিক পরিবর্তনের জন্যই হোক, কালাজ্বর আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল। রোগীর চোখে মুখে ফুটে উঠতে লাগল রোগমুক্তির লক্ষণ। পুরো আট আটটি মাস ভুগিয়ে শেষে জ্বর একদিন ছাড়লো। কিন্তু শরীর দুর্বল। হাঁটা চলাতে কষ্ট। কাজেই শুয়ে বসেই কাটছে বেশীর ভাগ সময়।

সে দিনও শুয়ে ছিলেন মিহির। হঠাৎ কানে এলো কিশোরীবাবুর গলা—মিহির ফার্স্ট ডিভিজনে পাশ করেছে। শুনে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিহির। উদ্দেশ্য বাইরে যাবন। এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন কিশোরীবাবু, পুত্রকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে আবারও পরিবেশন করলেন সাফল্য সংবাদ। তারপর আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে তুলে নিলেন কাঁধে। সে একরৈ রৈ ব্যাপার।

ওদিকে স্বভাব গম্ভীর মানুষটার কাণ্ড দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছেন মা, মুখে হাত চেপে হাসছে ভাইবোনেরা। লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন মিহির। কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে নেমে প্রনাম করলের বাবা-মাকে। তাঁদের মুখে সেদিন তিনি যে আশ্চর্য জ্যোতি লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁকে স্বর্গীয় আখ্যা দিলেও বোধ হয় তার সঠিক ব্যাখ্যা হবে না, ব্যাখ্যা করার মত বিশেষ কোন বিশেষণও বোধ হয় কোন অভিধানে মিলবে না।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

রাতের বেলায় খেতে বসেছেন কিশোরীবাবু। ডাইনে বিজয়, বামে বসেছেন মিহির। সামনে বসে পরিবেশন করছেন ঠাকুমা। এটা ওটা যোগান দিয়ে তাঁকে সাহায্য করছেন মা।

খেতে খেতে নিজের ঝোলের বাটি থেকে বেশ কিছুটা ঝোল বিজয় মিহিরের বাটিতে ঢেলে দিলেন কিশোরীবাবু। ভালো কিছু পেলেই তিনি ছেলেদের পাতে দিয়ে দেন—বাবার এ স্বভাবের কথা বিজয় মিহির জানতেন। সুতরাং তাঁরা কিছুই বললেন না, পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে চুপ মেরে গেলেন।

খাওয়া চললো। একটু পরে ঠাকুমা কিশোরীবাবুর বাটিতে একটু ঝোল দিতেই মুখ খুললেন মিহির। চোখে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে ডাকলেন—

—মা

—বল ?

—এবার থেকে তুমি আমাদের খেতে দিও।

—কেন ? মা দিলে পেট ভরে না বুঝি ?

—না, তা ঠিক নয়।

—তবে ?

—ঠাকুমা, ভালো জিনিসগুলো বেছে বেছে বাবাকেই বেশী করে দেন কিনা! তুমি খেতে দিলে আমরাও বেশী বেশী পাবো।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হাসলেন কিশোরীবাবু। হাসলেন ঠাকুমাও। বললেন : তা বটে। ছেলে বাটিশুদ্ধ দান করে দিলে মার মনে যেমন লাগে, বাপের মনেও তো তেমনিই লাগবে বাপু!

আবার হাসি'।



লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল মিহিরের মুখখানা। খাওয়া শেষ হলে উঠলেন তিনজনেই।

কাল তাহলে একটু সকাল সকাল তৈরী হয়ে নিও সব—বলতে বলতে মার হাতে মুখশুদ্ধির পাত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন কিশোরীবাবু।

মিহির এবার তাকালেন মার মুখের দিকে, বললেন—

—কাল কি মা ?

—কাল নবদ্বীপ যেতে হবে।

—নবদ্বীপ কেন ?

—পোড়া মার পূজা দিতে। তোমার অসুখের সময় তোমার বাবা মানত করেছিলেন।

পরের দিন পরিবারের সবাই গেলেন নবদ্বীপ। পুরোহিত মশায় পুজোর সমস্ত আয়োজন ঠিক করে দিলেন। স্নান সেরে শুচি শুদ্ধ হয়ে সবাই বসলেন বেদীর সামনে। পূজার আসনে বসলেন কিশোরীবাবু। তিনি নিজেই পুজো করবেন। আচমন করে পুজো শুরু করলেন তিনি।

ধুপ-দীপ-ফুল চন্দন-পুজোর নানান সরঞ্জাম, উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারন—সব মিলিয়ে তৈরী হলো এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ।

বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করে ধারালো একখানা ছুরি দিয়ে নিজের হাতে নিজের বুক চিরলেন কিশোরীবাবু। বেরিয়ে এলো রক্তের ধারা। সেই রক্তে জবা ফুল ভিজিয়ে রক্ত সিক্ত সেই ফুল নিবেদন করলেন।

এক ফাঁকে পুরোহিত মশায় কী যেন লাগিয়ে দিলেন কিশোরীবাবুর ক্ষতস্থানে।

সেদিন বাবাকে নিজের বুকে ছুরি চালাতে দেখে শিউরে উঠেছিলেন মিহির, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন ছুরি চালাতে বাবার হাত এতটুকু কাঁপেনি, শান্ত মুখমণ্ডলের কোন অংশ এতটুকু বিকৃত হয়নি।

কৃষ্ণনগর কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হয়েছেন মিহির। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। শরীরটা তখনো যেন একটু রোগাটে, বোধ হয় মাথায় একটু লম্বা হয়ে উঠেছেন বলে।

নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ শুরু হবে।

কলেজে এসেছেন মিহির।

চারদিকে শুধু অচেনা মুখের ভিড়। চেনামুখ খুবই কম। ক্লাস ঘরে প্রথম আলাপের মৃদুগুঞ্জন—নতুন ক্লাসে ওঠার আনন্দ উপ্‌চে পড়ছে সবার চোখে মুখে।

ঘণ্টা বাজলো। খাতা হাতে ক্লাসে ঢুকলেন, অধ্যাপকমশায়। মঞ্চে উঠে ছেলেদের বসতে বলে নাম ডাকলেন। তারপর শুরু করলেন ছাত্রদের পরিচয় নিতে। কার কী নাম, কোথায় বাড়ী, কোন স্কুলের ছাত্র ইত্যাদি খুঁটিনাটি প্রশ্ন। ছাত্রেরাও একে একে উত্তর দিচ্ছে।

—এই যে তুমি দাঁড়াও তো!

—উঠে দাঁড়ালেন মিহির।

—কি নাম তোমার ?

—মিহির স্যার—মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়।

—বাড়ী ?

—তাও তো বলিনি। আমি বলছি, আমাদের বংশের কেউ কোন দিন কারো কাছে ভিক্ষা নেননি, তাঁরা শুধু ভিক্ষা দিয়েছেন। তুমিই সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছো।

—আগেই তো বলেছি, বাবা,

ভিক্ষা আমরা নিজের জন্য করছি না। আমরা দেখেছি ভিক্ষা আজকাল অনেক সুস্থ সবল মানুষেরই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চোখে এ অন্যায় এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান। আমরা এদের দু একজনকে সাহায্য দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই। সবাইকে সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়—দু-একটা নজির গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। পথ একবার দেখিয়ে দিলে পথিকের অভাব হয় না।

একটু থামেন মিহির। তারপর বলেন—

—আমাদের কি ভুল হচ্ছে বাবা? আমরা কি কোন অন্যায় করছি?

—সেটা বোঝার দায়িত্ব তোমার নিজের। আমি আশা করবো, এমন কিছু নিশ্চয়ই করবে না, যাতে আমাদের বংশের সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা; আশীর্বাদ করুন, সে রকম কোন কাজ যেন কোনদিনই করতে না হয়।

বলতে বলতে বাবার পায়ে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকালেন মিহির। দৃষ্টি তাঁর অধোমুখী। মুখ তুললে দেখতে পেতেন, মেঘ কেটে গেছে। অদৃশ্য বস্তুর স্পর্শে পাষানের অন্তর গলে গিয়ে দুটি নাতি বৃহৎ সরোবরের সৃষ্টি করেছে, আর স্ফটিক—স্বচ্ছ সেই সরোবরে ফুটে উঠেছে দুটি নীলপদ্ম।

---



॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

---

আরও দু'দুটি বছর কেটে গেল। এলো অভিশপ্ত ১৯১৯ সাল কুখ্যাত রাওলাট আইন নিয়ে, রেখে গেল বৃটিশের নৃশংস বর্বরতার সাক্ষ্য জালিয়ানওয়ালা বাগ। প্রতিবাদে বৃটিশ প্রদত্ত নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যাগ্রহের দণ্ডহাতে ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। বসলো তদন্ত কমিশন। মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু সি, আর, দাস প্রমুখ কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা হলেন এই কমিশনের সদস্য। কমিশন প্রদত্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই রচিত হবে কংগ্রেসের পরবর্তী কর্মসূচী।

পথ ঘাট, হাট বাজার, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, প্রচার-পুস্তিকা, সংবাদ পত্র সর্বত্রই বৃটিশের হিংস্র দমন নীতির তীব্র সমালোচনা সারা ভারত তখন উত্তেজিত। সেই উত্তেজনার ঢেউ এসে লাগল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কলেজেও। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র হিসেবে মিহিরলালের মনেও সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান তাঁকে পাগল করে তুললো। বাবা মায়ের স্নেহবন্ধন কাটিয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের পথে বেরিয়ে পড়লো মিহিরলাল রাত্রির অন্ধকারে। তাঁর এক জেঠামশায় মিহিরকে ধরে বাড়ী নিয়ে এলে. বাড়িতে এসে মিহির দেখলেন যে তাঁর মা বাহিরের ঘরে লণ্ঠন নিয়ে সারারাত বসে বসে কাঁদছেন। পরে আবার ও একদিন বাপ, মায়ের অগোচরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন দেশের ডাকে। আর বাড়ী ফিরে আমৃত্যু ঘর বাঁধার চেষ্টা করলেন না। সেই দিন থেকেই দেশগঠনের মন্ত্রে তাঁর জীবনতরী কর্মসাগরে যাত্রা করল। বৌদ্ধ দর্শনের একটি আকুতি "সংঘং শরণংগচ্ছামি" আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামী দয়ানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সংঘ শক্তির অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে অবিভক্ত বাংলাদেশে অনুরূপ ভাবাদর্শে অনেকগুলি সংঘ গড়ে উঠেছিল। এমন একটির নাম ব্রাদার হুড্ বা ভ্রাতৃত্ব-মণ্ডলী। প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী উদিয়মান যুবনায়ক। উদ্দেশ্য—দেশসেবার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি। ধীরে ধীরে এই সংঘের শাখা গড়ে উঠলো বাংলার বিভিন্ন স্থানে নদীয়ার জেলা-শহর কৃষ্ণনগর এরূপ একটি শাখাকেন্দ্র উদ্যোক্তা শ্রীহেমন্ত সরকার। স্থানীয় প্রতিভাশালী তরুণ শ্রীমিহির লাল চ্যাটার্জীও কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজে বি, এস, সি, পাঠ ছেড়ে, ব্রাদারহুডের সঙ্গেই যুক্ত হলেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন, ধ্যান-ধারণা এবং সমাজ সেবামূলক কাজে দিনে দিনে পরিশীলি ও হয়ে উঠেছেন। এ দিকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলন নতুন মোড় নিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে সাধাণরত। অপর চরমপন্থী নেতা মহারাষ্ট্র কেশরী বালগঙ্গাধর তিলক দেহত্যাগ করেছেন। নতুন দিক দর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন মাহাত্মাগান্ধী। ১৯২০ সাল। কংগ্রেসের দুটি অধিবেশন বসলো। প্রথমটি ক'লকাতায়, সভাপতি লালা লাজপৎ রায়। দ্বিতীয়টি নাগপুরে, সভাপতি শ্রীবিজয় মাধব আচারিয়ার। ব্রাদারহুড্ কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে মিহিরলাল দুটি অধিবেশনেই যোগদান করলেন। অসহযোগ অন্দোলনের ডাক দিলেন মহাত্মাজী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মাজীর—নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলেন। ব্রাদারহুডের সবাই এতে অংশ নিলেন। মিহিরলালের বি, এস, সি

পরীক্ষা আর দেওয়া হল না। তবে ইংরাজী 'উচ্চারণ' শিথল ও শব্দচয়নভঙ্গী তৎসঙ্গে কঠোর ডিসিপ্লিন সারা-জীবনের অভ্যাস পরিণত হয়ে গেল ইংরেজ অধ্যাপকদের প্রভাবে।

ব্রাদারহুড্ কিছুকাল পরে সবিতা আশ্রম এবং পরে অভয় আশ্রম নামে নবরূপে পরিচিত হয়। অভয় নাম নেওয়া হয়েছিল মহাত্মাজীর সাজেশন অনুযায়ী, মানে নির্ভীক। সদস্যবর্গ গেলেন ঢাকা নগরীতে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের অন্যতম কর্মসূচী একলক্ষ কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ এবং চরকা প্রচারে ব্রতী হওয়া। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবর্গ ঢাকার গ্রামে গ্রামে পদযাত্রা করেছেন। প্রত্যেকের কাঁধে দু'টি থলি: একটিতে কাঁচাতুলা, অন্যটিতে কুটনীদের হাতে কাটা সুতোর লাছি। সপ্তাহে দু'দিন পদযাত্রা ঢাকা নগরীতে। কাঁধে খদ্দরের ঝোলা নিয়ে খদ্দর চাই, খদ্দর চাই হেঁকে খদ্দর বিক্রয় করছেন ঢাকা নগরীর পথে পথে। মিহিরলালও এদের সাথী। নিদারুন আর্থিক সংকট, স্বেচ্ছাদারিদ্রবরণ। থাকেন পরিত্যক্ত একটা জীর্ণ ভবনে, প্রতিদিন আহার জুটে না। মহাত্মাজী বাক্‌শক্তি অমোঘ—শ্রমের বিনিময়ে অর্থ নিতে পারবে না, ওটা intellectual prostitution লোকে যদি তোমাদের প্রয়োজন বোধ করে, খেতে পরতে দেবে। প্রানপ্রাচুর্যে ভরপুর মিহিরলাল এতে দমবার পাত্র নন। প্রাতঃস্নানের পর ডাঃ ব্যানার্জী একদিন ব্যাখ্যা করছেন—ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ। এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক নিয়ে এলেন কিছুটা সোনা—মুগের ডাল। শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জ্জী, মিহিরলাল প্রমুখ "সোনা মুগের ডাল" "সোনা মুগের ডাল" বলে এমন হৈ-হুল্লোড় সুরু করে দিলেন যে ডাঃ ব্যানার্জ্জী বললেন—নদে' জেলায় বন্যা বইছে যেন, আজ ব্যাখ্যা থাক। বলা বাহুল্য, এঁরা দু'জনেই নদীয়ার সন্তান। ঢাকার সুবিশাল রমনা ময়দান বিকেলে চক্কর দিয়ে আট মাইল দৌড়ে আশ্রমে ফিরে দু'সের চাউলের ভাত নুন দিয়ে পরমানন্দে ভক্ষণ মিহিরলাল ও সুশীল পালিতের অপর কাণ্ড। ঢাকার পদ্মা নদী বাইশ মাইল সাঁতরে ফরিদপুরের উপকূলে ওঠা সুঠামদেহী মিহিরলালও শ্রীদেবেন সেনের পক্ষেই সম্ভব। একথা অনেকেই জানেন না যে, অভয় আশ্রমের আদিপর্বে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের একান্ত সচিব প্রথমে ছিলেন সুশীল পালিত। পরে ১৯৩০ সালে পর্য্যন্ত এই পদে ছিলেন মিহিরলাল। শ্রীহেমন্ত সরকার সুভাষের সঙ্গে বার বছর" গ্রন্থের লেখক। [ শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চৌধুরী, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অর্থমন্ত্রী। শ্রীহরিপদ চ্যাটার্জ্জী, পরবর্তীকালে লোক-সভা সদস্য। শ্রীসুশীল পালিত পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বাঁকুড়া জেলাবোর্ডের চেয়ার ম্যান। শ্রীদেবেন সেন পরবর্তী কালে বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ও লোকসভা সদস্য। ]

১৯২৩ সালে অভয় আশ্রম কুমিল্লা শহরের উপকণ্ঠে পীলগ্রীমস্ রোডের ধারে পঞ্চাশ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠে। অন্যদিকে ১৯২৪ সালে ক'লকাতার উত্তর উপকণ্ঠে—সোদপুরে শ্রীসতীচন্দ্র দাশগুপ্ত স্থাপন করলেন "খাদি প্রতিষ্ঠান।" ডঃ ঘোষ, মিহিরলাল এবং আরও চারজন তখন খাদি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। তাঁরা থাকেন সোদপুরে। কিন্তু এঁদের এই মিলন স্থায়ী হল না। ডাঃ নৃপেন বসুর প্রভাবে ১৯২৬ সালে ডাঃ ঘোষ, মিহিরলাল অন্যান্য চারজন সহ পুনরায় অভয় আশ্রমে ফিরিয়া এলেন।

ত্রিপুরা জেলায় অভয় আশ্রমের বহুবিধ অবদানের মধ্যে একটি হল—ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার। প্রতি রবিবার প্রাতে আশ্রমিকগণ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পল্লী পরিক্রমা করেন। প্রত্যেকের কাঁধে দু'টি ব্যাগ: একটি থেকে বই বার করে দিচ্ছেন ও নিচ্ছেন। অন্যটিতে পল্লীর মা বোনেরা মুষ্টিভিক্ষা দিচ্ছেন। ১৯২৮ সালে



প্রকাশিত আশ্রমের একটি রিপোর্ট জানা যায়, এই মুষ্টি ভিক্ষায় সংগৃহীত চাল থেকে অভয় আশ্রম হাসপাতালে ৪টি বেডের খরচ চলছে। মোট শয্যা সংখ্যা তখন ২৬টি। খালি পা। পরনে মালকোচা, খাটো ৬ হাত ধুতি, গায়ে নিমা। মাথায় গান্ধীটুপি। সবই খদ্দরের। পাঁচজন করে প্রতিটি গ্রুপ। দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ সমুন্নত মস্তক মিহিরলাল বাঁশি বাজিয়ে লাইব্রেরী মুভমেণ্টের গ্রুপগুলিকে একে একে রওনা করিয়ে দিচ্ছেন। পরে নিজে সাইকেলে বেরিয়ে পড়েছেন শহর পরিক্রমারত গ্রুপগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য। এইকাজে মিহিরলালের দুইজন সহকারী: একজন শ্রী জগদীশ পালিত, পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অপর শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী, পরে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লীতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনাকালে গণপরিষদের সদস্যরূপে ভাষণদান প্রসঙ্গে মিহিরলালের কম্বুকণ্ঠেই একথা শোভা পায়—ভারতে জনশিক্ষা প্রসারের একমাত্র হাতিয়ার লাইব্রেরী মুভমেণ্ট, লাইব্রেরী মুভমেণ্ট।

১৯২৭ সাল। ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলন। আশ্রম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিহিরলালও এতে যোগদিলেন। কিন্তু ঐক্য সম্মেলনের পরেই ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে কুমিল্লার অভয় আশ্রম আক্রমণে উদ্যত হল মুসলীম লীগ। ২৩০ জনের এক ভলাণ্টিয়ার বাহিনী আশ্রম রক্ষায় উদ্যোগী। এতে এক নম্বর গ্রুপের ক্যাপ্টেন ছিলেন মিহিরলাল। ডাঃ নৃপেন বসু লিখেছেন—

"বেলা প্রায় একটা নাগাদ আশ্রমের উত্তরপূর্বে কোনে-মুরাদপুরের দিক হইতে মুসলীম লীগের ধ্বনি শোনা গেল। সুরেশদা একটা টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া সকলকে অবিকম্প কণ্ঠে বলিলেন—

"ভাইসব, আজকের সমরে তোমরা যদি কেউ বেঁচে থাকো, তবে মহাত্মজীকে বলো যে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী পালি'য় যায় নাই, বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছে।"

—এই বলে তিনি প্রতিটি গ্রুপকে পজিশন নেবার আদেশ দিলেন—'নৃপেন! তুমি একা খালি হাতে আশ্রমের বাইরে পঁচিশ কদম এগিয়ে যাও। কাঁধ বরাবর ডাইনে বামে দুই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকো।

এক নম্বর গ্রুপ—

তোমরা আশ্রমের বাইরে দশ কদম এগিয়ে যাও। দুশমন যদি নৃপেনকে বাধা দেয় বা তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, তবে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে দুশমনকে আক্রমণ করবে। জীবন্ত অবস্থায় কেউ আশ্রমে ফিরবে না। একজনও না। মিহির—হুঁশিয়ার।

এক নম্বর গ্রুপের ক্যাপ্টেন মিহিরলাল চ্যাটার্জ্জী উচ্চকণ্ঠে 'ইয়া' আওয়াজ করতেই আমি ( সঞ্জীব গুহরায় ) এক দুই তিন করিয়া মাপিয়া মাপিয়া পঁচিশ কদম আশ্রমের বাহিরে গেলাম। কাঁধ বরাবর ডাইনে বসে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমার ৪০/৫০ হাত দূরে মিছিলটি রাখিয়া উত্তেজনাকর শ্লোগান দিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমাকে কেহ ধাক্কা দিল না অথবা আমাকে অতিক্রম করিয়া উহারা আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল না। ২৫/৩০ মিনিট পর মিছিলটি কেরানী সাহেবের বাড়ীর পাশ দিয়া ফিরিয়া গেল।

বেলা দুইটা নাগাদ ৪/৫ শত লোকের ছোট একটি মিছিল পীল্‌গ্রীমস্ রোড ধরিয়া আশ্রমের সদর পথে আসিতেই সুরেশদা চীৎকার করিয়া বলিলেন—

অহম্, তুমি একা লাঠি হাতে আশ্রমের বাহিরে এক কদম যাও। দুশমন তোমার সামনে আসামাত্র একা জীবন পণ লাঠি চালাবে। হয় দুশমন পালাবে, নয় তুমি বীরের মতন মৃত্যুবরণ করবে।

এক নম্বর গ্রুপ—

—অহম্ যদি মাটীতে পড়ে যায়, তোমরা এগিয়ে গিয়ে দুশমনকে আক্রমণ করবে।

মিহির-হুঁশিয়ার—

অহমের ভাল নাম মহেন্দ্র হাজারিকা। আমাদের ছেলে। একজন উদ্যোগী তরুণ আশ্রমিক। সুঠাম দেহ। স্বাধীন ভারতে শ্রীমহেন্দ্র হাজারিকা অনেক বৎসর আসামের কুটিরশিল্প মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এইবারও আশ্চর্য। কেহ অহমকে আমন্ত্রণ করিল না। মিছিলটি ফিরিয়া গেল।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ সংবাদ পাওয়া গেল যে, ২৫/৩০ হাজার লোকের একটি বিরাট মিছিল দক্ষিণ চুলিপাড়া আমবাগানের সামনে দিয়া আসিতেছে উহাদের প্রবল ধ্বনিতে আমাদের নিজেদের মধ্যেও কথা ভাল শোনা যাইতেছে না। উহারা আসা পর্যন্ত সম্ভবতঃ বেলা গড়াইয়া অন্ধকার হইতে আরম্ভ করিবে। সুরেশ দা সজোরে কহিলেন—

'এক নম্বর গ্রুপ—দৌড়ে আইলের সামনে ৫০ হাত যাও। পজিশান নাও। আক্রমণের জন্য তৈর হও। মিহির এবার দায়িত্ব তোমার। Command your group. Win or perish.

দুই নম্বর গ্রুপ—এক নম্বর গ্রুপের স্থানে যাও। দেবেন—হুঁশিয়ার—

আদেশ পাওয়া মাত্র মিহিরের নেতৃত্বে এক নম্বর গ্রুপ দৌড়াইয়া ৫০ হাত দূরে আইলের সামনে লাঠি হাতে দাঁড়াইল। আর দুই নম্বর গ্রুপের নেতা দেবেন মন তাঁহার গ্রুপকে নিয়া এক নম্বর গ্রুপের শূন্যস্থানে দৌড়াইয়া গেল।

ঐ দিকে দূরে মিহিরের জোরালো কণ্ঠ—শোনা গেল—দল—প্রস্তুত—''

[ ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু : ব্রাদারহুড থেকে সবিতা মিশন' কর্মযোগিন। অক্টোবর ১৯৮৪ ]

সংঘ তৈরী করা সহজ। কিন্তু সংঘ রক্ষা করতে হলে জীবন আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, মিহিরলাল সংঘ রক্ষার্থে জীবনদানে অগ্রগামী সৈনিক।

১৯২৯ সাল। কুমিল্লা শহরের নিকট গোমতী নদীর উপর নির্মিত বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার নিকটস্থ নদী তিতাস এবং মেঘনায় প্রবল বন্যা। বহু ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পাওয়া মাত্র অভয় আশ্রম ত্রাণকার্যে ছুটে যায়। মিহিরলাল এতেও আগ্রহী। বন্যাত্রাণের পর লোকের পুনর্বাসনা এবং কর্মসংস্থান। অনেকগুলো চরকা কেন্দ্র স্থাপিত হল। মিহির লাল ছিলেন রাজাপুর কেন্দ্রের পরিচালক। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকৃত রিলিফের সঙ্গে এদের রিলিফের একটি প্রধান পার্থক্য আছে। জনসেবার সঙ্গে এরা সাংগঠনিক দিকেও নজর রাখেন। মিহির লাল তাই আশ্রমের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজপুর চরকা কেন্দ্রকে কংগ্রেসের একটি ঘাঁটিরূপে গড়ে তুললেন।

১৯৩০ সালে। মহাত্মাজী আরম্ভ করেছেন লবণ সত্যাগ্রহ। লবণ কেন? এর সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক কি? মহাত্মাজী বললেন—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। রৌদ্রতাপদগ্ধ। তাই এরা অধিক পরিমাণে লবণ খায়। দরিদ্র মানুষের এই সামান্য খাদ্য উপকরণের উপর ট্যাক্স্ চালানো চলবে না। এই আইন



তিনি অমান্য করবেন। বিরোধীরা ভ্রুকুটি তুললেন—এতে আর কি হবে? হাস্যকর প্রয়াস নয় কি? প্রত্যয় সিদ্ধ কণ্ঠে বললেন মহাত্মাজী—হম্ যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে মারে ভারত উথল-পথল পড়েগী। তাই হল। বাংলায় সাজ সাজ রব। অভয় আশ্রম অগ্রনী। স্থির হল, কুমিল্লা থেকে কলকাতা হয়ে বাঁকুড়া জেলায় শ্রীসুশীল পালিতের স্বগ্রাম বেতুড় পৌছুবে সত্যাগ্রহীদল। সেখান থেকে ডাঃ সুরেশ ব্যাণার্জী পদযাত্রা করে সত্যাগ্রহীদের নিয়ে যাবেন মেদিনীপুর জেলার কাঁথির সমুদ্রসৈকতে লবণ আইন অমান্য করার জন্য।

ডাঃ ব্যাণার্জী ও অন্নদাচৌধুরী আগেই ক'লকাতা রওনা হয়ে গিয়েছেন। আরও সত্যাগ্রহী জোগানের জন্য ডাঃ নৃপেন বসু কুমিল্লা রয়ে গেলেন। কুমিল্লা হতে কলকাতা যাত্রাপথে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দিলেন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ। সহকারী নেতা মনোনীত হলেন ডাঃ নিবারণ দে সরকার ও মিহিরলাল। আজ থেকে বহু বছর আগেকার এই সত্যাগ্রহ যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন পত্র পত্রিকায় সাক্ষ্য মিলবে। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, একটি সংঘ—অভয় আশ্রম-নেতৃত্ব দিল লবণ সত্যাগ্রহে অভিভিক্ত বঙ্গ দেশে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর এই লবণ সত্যাগ্রহ হচ্ছে মহাত্মাজীর দ্বিতীয় গণ আন্দোলন।

কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন। উদ্বোধক—সুভাষ চন্দ্রবসু। তিনি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। কথা ছিল, সম্মেলনের পর রাত্রে সুভাষচন্দ্র অভয় আশ্রমে আহার করবেন একথা অনেকের জানা নেই যে, ব্রাদার হুডের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন সুভাষচন্দ্র। আত্মজীবনী An Indian pilgrim গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সেই সুবাদে বয়ো কনিষ্ঠ মিহির লালকে বিশেষ স্নেহ করতেন সুভাষচন্দ্র। শহরে মিটিং শেষ করে আশ্রমে সুভাষ চন্দ্র যখন এলেন অনেক রাত হয়ে গেছে। আশ্রমের কাজ চলে ঘড়ি ঘণ্টা ধরে। সবাই শুয়ে পড়েছেন। সুভাষচন্দ্রের গাড়ী ফটকে ঢুকলো। সকলে উঠলেন, কিন্তু গম্ভীর। অভিমানে কেউ 'সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছেন না। এমন সময় স্নেহধন্য মিহিরলাল অগ্রজ প্রতিম সুভাষচন্দ্রকে খুব বকাবকি শুরু করলেন। সুভাষচন্দ্র অগত্যা ডাঃ ব্যানার্জীর ঘরে গিয়ে বললেন—"দেখো দেখো সুরেশদা। মিহির পর্য্যন্ত আমায় বকছে।'' ডাঃ ব্যানার্জী হেসে বললেন "মিহির তোমার ছোট ভাই। সারাদিন ধরে বলছে, আজ রাতে সুভাষদা আসবেন, সুভাষদার সঙ্গে একসঙ্গে অনেকদিন পর বসে খাব। তুমি দেরী করলে, তাই অভিমান।'' সুভাষচন্দ্র তখন মিহিরলালকে স্নেহলিঙ্গন করলেন। ডাঃ নৃপেনবসুর আত্মজীবনী ব্রাদারহুড থেকে সবিতা মিশনে এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা আজকের কর্মী সমাজের গোচরে আনা দরকার।

১৯৩২ সালে। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছেন মহাত্মাজী। মেদিনীপুর শহরকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব বর্তাল অভয় আশ্রমের উপর। এই কাজে আশ্রম থেকে দুইজন সদস্য প্রেরিত হলেন—মিহিরলাল ও সত্যরঞ্জন সেন (পরবর্তীকালে সুবিখ্যাত রেশম শিল্প বিশেষজ্ঞ)। এরা প্রথমে সেখানে গিয়ে একটি খদ্দরের দোকান ও লাইব্রেরী খুললেন। অচিরেই পুলিশের প্রকোপে মেদিনীপুর জেল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। অভয় আশ্রম তখনও বেআইনী। ডাঃ ব্যানার্জীর নির্দেশে একজন আশ্রমিক কলকাতা থেকে কুমিল্লা রওনা হলেন। জেলা ম্যাজিস্টেটকে নোটীশ দিলেন—আশ্রম দখল নেবেন। নেতা মিহিরলাল। নির্দ্ধারিত সময়ে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আশ্রম ফটকেই পৌছুতেই বিরাট পুলিশবাহিনী কর্ত্তৃক বেপরোয়া লাঠি চালনা আরম্ভ হল। রক্তাপ্লুত অবস্থায় মিহিরলাল ও অন্যান্যদের স্থানীয় লোকেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। একথা সত্য যে, বীরভূমের

অহম্, তুমি একা লাঠি হাতে আশ্রমের বাহিরে এক কদম যাও। দুশমন তোমার সামনে আসামাত্র একা জীবন পণ লাঠি চালাবে। হয় দুশমন পালাবে, নয় তুমি বীরের মতন মৃত্যুবরণ করবে।

এক নম্বর গ্রুপ—

—অহম্ যদি মাটীতে পড়ে যায়, তোমরা এগিয়ে গিয়ে দুশমনকে আক্রমণ করবে।

মিহির-হুঁশিয়ার—

অহমের ভাল নাম মহেন্দ্র হাজারিকা। আমাদের ছেলে। একজন উদ্যোগী তরুণ আশ্রমিক। সুঠাম দেহ। স্বাধীন ভারতে শ্রীমহেন্দ্র হাজারিকা অনেক বৎসর আসামের কুটিরশিল্প মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এইবারও আশ্চর্য। কেহ অহমকে আমন্ত্রণ করিল না। মিছিলটি ফিরিয়া গেল।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ সংবাদ পাওয়া গেল যে, ২৫/৩০ হাজার লোকের একটি বিরাট মিছিল দক্ষিণ চুলিপাড়া আমবাগানের সামনে দিয়া আসিতেছে উহাদের প্রবল ধ্বনিতে আমাদের নিজেদের মধ্যেও কথা ভাল শোনা যাইতেছে না। উহারা আসা পর্যন্ত সম্ভবতঃ বেলা গড়াইয়া অন্ধকার হইতে আরম্ভ করিবে। সুরেশ দা সজোরে কহিলেন—

'এক নম্বর গ্রুপ—দৌড়ে আইলের সামনে ৫০ হাত যাও। পজিশান নাও। আক্রমণের জন্য তৈর হও। মিহির এবার দায়িত্ব তোমার। Command your group. Win or perish.

দুই নম্বর গ্রুপ—এক নম্বর গ্রুপের স্থানে যাও। দেবেন—হুঁশিয়ার—

আদেশ পাওয়া মাত্র মিহিরের নেতৃত্বে এক নম্বর গ্রুপ দৌড়াইয়া ৫০ হাত দূরে আইলের সামনে লাঠি হাতে দাঁড়াইল। আর দুই নম্বর গ্রুপের নেতা দেবেন মন তাঁহার গ্রুপকে নিয়া এক নম্বর গ্রুপের শূন্যস্থানে দৌড়াইয়া গেল।

ঐ দিকে দূরে মিহিরের জোরালো কণ্ঠ—শোনা গেল—দল—প্রস্তুত—"

[ ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু : ব্রাদারহুড থেকে সবিতা মিশন' কর্মযোগিন। অক্টোবর ১৯৮৪ ]

সংঘ তৈরী করা সহজ। কিন্তু সংঘ রক্ষা করতে হলে জীবন আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, মিহিরলাল সংঘ রক্ষার্থে জীবনদানে অগ্রগামী সৈনিক।

১৯২৯ সাল। কুমিল্লা শহরের নিকট গোমতী নদীর উপর নির্মিত বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার নিকটস্থ নদী তিতাস এবং মেঘনায় প্রবল বন্যা। বহু ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ পাওয়া মাত্র অভয় আশ্রম ত্রাণকার্যে ছুটে যায়। মিহিরলাল এতেও আগ্রহী। বন্যাত্রাণের পর লোকের পুনর্বাসনা এবং কর্মসংস্থান। অনেকগুলো চরকা কেন্দ্র স্থাপিত হল। মিহির লাল ছিলেন রাজাপুর কেন্দ্রের পরিচালক। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকৃত রিলিফের সঙ্গে এদের রিলিফের একটি প্রধান পার্থক্য আছে। জনসেবার সঙ্গে এরা সাংগঠনিক দিকেও নজর রাখেন। মিহির লাল তাই আশ্রমের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজপুর চরকা কেন্দ্রকে কংগ্রেসের একটি ঘাঁটিরূপে গড়ে তুললেন।

১৯৩০ সালে। মহাত্মাজী আরম্ভ করেছেন লবণ সত্যাগ্রহ। লবণ কেন? এর সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক কি? মহাত্মাজী বললেন—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। রৌদ্রতাপদগ্ধ। তাই এরা অধিক পরিমাণে লবণ খায়। দরিদ্র মানুষের এই সামান্য খাদ্য উপকরণের উপর ট্যাক্স্ চালানো চলবে না। এই আইন



তিনি অমান্য করবেন। বিরোধীরা ভ্রূকুটি তুললেন—এতে আর কি হবে? হাস্যকর প্রয়াস নয় কি? প্রত্যয় সিদ্ধ কণ্ঠে বললেন মহাত্মাজী—হম্ যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে সারে ভারত উথল-পথল পড়েগী। তাই হল। বাংলায় সাজ সাজ রব। অভয় আশ্রম অগ্রনী। স্থির হল, কুমিল্লা থেকে কলকাতা হয়ে বাঁকুড়া জেলায় শ্রীসুশীল পালিতের স্বগ্রাম বেতুড় পৌছুবে সত্যাগ্রহীদল। সেখান থেকে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জী পদযাত্রা করে সত্যাগ্রহীদের নিয়ে যাবেন মেদিনীপুর জেলার কাঁথির সমুদ্রসৈকতে লবণ আইন অমান্য করার জন্য।

ডাঃ ব্যাণার্জ্জী ও অন্নদাচৌধুরী আগেই ক'লকাতা রওনা হয়ে গিয়েছেন। আরও সত্যাগ্রহী জোগানের জন্য ডাঃ নৃপেন বসু কুমিল্লা রয়ে গেলেন। কুমিল্লা হতে কলকাতা যাত্রাপথে সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দিলেন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ। সহকারী নেতা মনোনীত হলেন ডাঃ নিবারণ দে সরকার ও মিহিরলাল। আজ থেকে বহু বছর আগেকার এই সত্যাগ্রহ যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন পত্র পত্রিকায় সাক্ষ্য মিলবে। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, একটি সংঘ—অভয় আশ্রম-নেতৃত্ব দিল লবণ সত্যাগ্রহে অভিভিক্ত বঙ্গ দেশে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর এই লবণ সত্যাগ্রহ হচ্ছে মহাত্মাজীর দ্বিতীয় গণ আন্দোলন।

কুমিল্লা শহরে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সম্মেলন। উদ্বোধক—সুভাষ চন্দ্রবসু। তিনি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। কথা ছিল, সম্মেলনের পর রাত্রে সুভাষচন্দ্র অভয় আশ্রমে আহার করবেন একথা অনেকের জানা নেই যে, ব্রাদার হুডের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন সুভাষচন্দ্র। আত্মজীবনী An Indian pilgrim গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সেই সুবাদে বয়োকনিষ্ঠ মিহির লালকে বিশেষ স্নেহ করতেন সুভাষচন্দ্র। শহরে মিটিং শেষ করে আশ্রমে সুভাষ চন্দ্র যখন এলেন অনেক রাত হয়ে গেছে। আশ্রমের কাজ চলে ঘড়ি ঘণ্টা ধরে। সবাই শুয়ে পড়েছেন। সুভাষচন্দ্রের গাড়ী ফটকে ঢুকলো। সকলে উঠলেন, কিন্তু গম্ভীর। অভিমানে কেউ 'সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছেন না। এমন সময় স্নেহধন্য মিহিরলাল অগ্রজ প্রতিম সুভাষচন্দ্রকে খুব বকাবকি শুরু করলেন। সুভাষচন্দ্র অগত্যা ডাঃ ব্যানার্জ্জীর ঘরে গিয়ে বললেন—"দেখো দেখো সুরেশদা। মিহির পর্য্যন্ত আমায় বকছে।" ডাঃ ব্যানার্জ্জী হেসে বললেন "মিহির তোমার ছোট ভাই। সারাদিন ধরে বলছে, আজ রাতে সুভাষদা আসবেন, সুভাষদার সঙ্গে একসঙ্গে অনেকদিন পর বসে খাব। তুমি দেরী করলে, তাই অভিমান।" সুভাষচন্দ্র তখন মিহিরলালকে স্নেহলিঙ্গন করলেন। ডাঃ নৃপেনবসুর আত্মজীবনী ব্রাদারহুড থেকে সবিতা মিশনে এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা আজকের কর্মী সমাজের গোচরে আনা দরকার।

১৯৩২ সালে। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছেন মহাত্মাজী। মেদিনীপুর শহরকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্ব বর্তাল অভয় আশ্রমের উপর। এই কাজে আশ্রম থেকে দুইজন সদস্য প্রেরিত হলেন—মিহিরলাল ও সত্যরঞ্জন সেন (পরবর্তীকালে সুবিখ্যাত রেশম শিল্প বিশেষজ্ঞ)। এরা প্রথমে সেখানে গিয়ে একটি খদ্দরের দোকান ও লাইব্রেরী খুললেন। অচিরেই পুলিশের প্রকোপে মেদিনীপুর জেল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। অভয় আশ্রম তখনও বেআইনী। ডাঃ ব্যানার্জ্জীর নির্দ্দেশে একজন আশ্রমিক কলকাতা থেকে কুমিল্লা রওনা হলেন। জেলা ম্যাজিস্টেটকে নোটীশ দিলেন—আশ্রম দখল নেবেন। নেতা মিহিরলাল। নির্দ্ধারিত সময়ে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আশ্রম ফটকেই পৌছুতেই বিরাট পুলিশবাহিনী কর্ত্তৃক বেপরোয়া লাঠি চালনা আরম্ভ হল। রক্তাপ্লুত অবস্থায় মিহিরলাল ও অন্যান্যদের স্থানীয় লোকেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। একথা সত্য যে, বীরভূমের

স্বসন্তান, পরবর্ত্তীকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যশস্বী সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়কে অভয় আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত করার মূলে ছিলেন মিহিরলাল। মিহিরলালের পরিচয় সূত্র ধরেই কুমিল্লা শ্রীকাইল কলেজের প্রথিতযশা অধ্যাপক সত্যেন চ্যাটার্জ্জী ভরাযৌবনে ডাঃ নৃপেন বসুর প্রভাবে দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। যৌবনে অনেকগুলো বসন্ত-মিহিরলালকে কাটাতে হয়েছে বৃটিশ কারাগারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কেননা প্রতি দেশে প্রতিকূল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাযন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। তবে বড়ো কথা হল, কারাগারে তিনি ভেঙ্গে পড়েননি বা কারামুক্তির পর অন্যস্রোতে জীবন ভাসিয়ে দেননি, জীবনের দিশা ত্যাগ করেননি। ঠিকাদার মল্লিনাথ বলেছেন বাঙালী চরিত্র চেতনের মতন; মচকায় ভাঙ্গেনা। বেশভূষায় চলনে-বলনে কথনে-মননে মিহিরলাল আদর্শ বঙ্গসন্তান। ত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রতিযোগিতায় তিনি কারো পেছনে ছিলেন না।

—: :—





## ॥ তৃতীয় পর্ব ॥

১৯৩৪ সাল। মেদিনীপুর থেকে বিতাড়িত হবার পর মিহিরলালের জীবন অকুলে ভাসতে ভাসতে একদিন বীরভূমের কুলে এসে পৌছল। তখন মিহিরবাবু ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষের সাথে নানা কর্ম পন্থায় জড়িত থেকে কর্মবীরের আদর্শ পালন করছিলেন। জেলার প্রবীন কংগ্রেস নেতা সুরেন সরকার ও কামদা কিঙ্কর মুখোপাধ্যায় বীরভূমে কংগ্রেস সংগঠন করার মানসে একজন সুদক্ষ কর্মযোগীর সন্ধান করছিলেন। তাঁদের আহ্বানে তিনি ১৯৩৭ সালে বীরভূমে এসে বীরভূম কংগ্রেস সংগঠনের কাজে যোগ দিলেন। ধীরে ধীরে বীরভূমের ডাঃ শরৎ মুখার্জী, সত্যেন চ্যাটার্জী, লালবিহারী সিংহ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে মিশে গেলেন। প্রথমে তিনি সিউড়ি নিবাসী কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জীর বাড়ীতে আশ্রয় পেলেন এবং কালক্রমে বীরভূমের এক সুদক্ষ নেতার পরিচিতি লাভ করলেন। ১৯৩৭ সাল কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী রাজনগর ও খয়ড়াশোল থানার কংগ্রেস কর্মীদের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির মানসে মিহিরলাল ১৯৩৭ সালে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম তাঁতিপাড়ায় চলে আসেন। এই গ্রামের তেজস্বী যুবনেতা অমিয়ানন্দ দাস ও অহল্যাদেবী ( কংগ্রেসের পিসিরা ) এর সহায়তায় জমি ক্রয় করে একটি কংগ্রেস অফিস স্থাপন করেন। এই অফিসেই মিহিরলালের শেষ জীবন কাটে। এই সময় সমাজ সেবী ও নিরলস কংগ্রেস কর্মী মিহিরলাল একদিকে দেশ গঠনের কাজ, অন্যদিকে সমাজ সংস্কারে মন দেন। স্থানীয় যুবক ও স্কুল ছাত্রদের নিয়ে তিনি প্রতিদিন "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রদক্ষিণ করে জনমনে দেশ প্রেম জাগিয়ে তুলতেন। উল্লেখযোগ্য কর্মীদের মধ্যে বলরাম রুজ, গোলাম দাস, নিতাই পদ দাস, বিপিন দাস, সত্য পদ গুঁই, বাসুদেব দাস, বংশী দত্ত স্মরনীয়। এদের মধ্যে অমিয়া নন্দ দাস ও আরও অনেকে মিহিরবাবুর সাথে নানা আন্দোলনে কারাবরণ করেন। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁতিপাড়া গ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক গঠন মূলক কংগ্রেস কর্মীদের এক সভার আয়োজন করেন মিহিরলাল। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেণ। সভাপতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার মানসে দুবরাজপুর রেল স্টেশন থেকে তাঁতিপাড়া পর্য্যন্ত খুব সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে কিশোরীলাল মশ্রুবালা ও তাঁর স্ত্রী, অতুল্য ঘোষ ও মথুরা প্রসাদ জী এসেছিলেন। এই সম্মেলনের ফলে এই অঞ্চলে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন ও কংগ্রেস সংগঠন খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। বীরভূম বাসীরা চাঁদা দিয়ে এই ব্যয় নির্ব্বাহ করেছিলেন। অবশ্য বিরোধী দল সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিয়ে চাঁদা সংগ্রহে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু তাদের দুরভি সন্ধি ব্যর্থ হয়। জেলার নামকরা দক্ষ নেতাদের মধ্যে উপস্থিত

ছিলেন জাজিগ্রামের লালবিহারী সিং ও অন্যান্যরা। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠন কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার পালিত বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠনের জন্য লালবিহারী সিংহকে সম্পাদক ও ৫ জন সদস্য মনোনীত করেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ শরৎ মুখার্জ্জী, মিহিরলাল চ্যাটার্জ্জী, গোপিকা বিলাস সেন, অনাদি কিঙ্কর রায় ও বিভূতি মুখার্জ্জী। সম্পাদক লালবিহারী একদিন মিহিরবাবুর পরামর্শে সমস্ত সদস্য ও কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে ডাঃ মুখার্জ্জীর বাড়ীতে সভা করেন, যাতে সৈনিকের মত সমস্ত কর্মী দেশ উদ্ধারের কাজ করতে পারেন। বীরভূমে গঠনমূলক কাজ করার জন্য মিহিরলাল বিভিন্ন কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করতে লাগলেন। ১৯৪০ সালে একবার বীরভূম মুর্শিদাবাদ গঠণমূলক কংগ্রেস কর্মীদের একসভা লালবিহারী সিংহের বন্ধু দুর্গাশঙ্কর শুক্ল জাজিগ্রামে আহ্বান করেন। সম্মেলনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য মিহিরবাবু লালবিহারী প্রমুখ কর্মীদের নিয়ে রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই ··ইত্যাদি স্থানে গিয়ে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সাঁওতাল পরগনার পাকুড় ও মহেশপুর থানার বহু সাঁওতাল কর্মী অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সভায় যোগ দিয়েছিলেন। মিহিরবাবু সভার ২/৩ দিন আগেই সেখানে গিয়েছিল। তিনিই সব কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। প্রতিনিধি ও দর্শকদের থাকা-খাওয়া, রান্না ইত্যাদির সব রকম বন্দোবস্ত তিনিই করেন। ডাঃ ঘোষের সাথে মেদিনীপুর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি কুমার জানা ও ডায়মণ্ডহারবারের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী সভায় যোগ দেন। সাঁওতাল কর্মীগণ সারবন্দীভাবে নাগড়া বাজিয়ে সকলের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। মুসলমান, হরিজন এমন কি মহিলারাও সভায় যোগ দিয়ে সকলের মধ্যে সংহতি রচনা করেছিল। বক্তা ছিলেন ডাঃ ঘোষ, ডাঃ শরৎ মুখার্জী, মিহিরবাবু, চারুবাবু, কুমারবাবু, বিজয় ঘোষাল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিরা। তিন দিন ধরে নির্বিঘ্নে মহা সমারোহে এই সম্মেলনীর কাজ সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং সভার উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করে। জাতির জনক মহাত্মা-গান্ধীর আহ্বানে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভ্যরা একবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। সংবাদপত্রে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিহিরবাবু ও শরৎবাবু ব্যক্তিগত ভাবে সত্যাগ্রহ করতে মনস্থ করেন। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৪০ ছিল এই সময়। ঐ দিন জেলার বহু কর্মী সিউড়িতে সমবেত হয়। প্রথমে শরৎবাবু ও পরে মিহিরবাবু সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। জেলগেটে বিচারক সদর এস, ডি, ও এর বিচারে তাঁদের বিনাশ্রম এক বছর জেল হয়।

১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে সুরু হ'ল বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। তাঁতিপাড়াতে এই সময় সত্যাগ্রহ শিক্ষা শিবির আরম্ভ হয়েছিল। গান্ধীবাদ সম্পর্কে শিক্ষাদান, প্রার্থনা, সুতাকাটা শরীরশ্রম, হরিজন বস্তী সংস্কার, আলোচনা ও জনসভা ইত্যাদি ছিল কর্মসূচীর অন্তর্গত। প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও সভা ডাকা হত। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে অমিয়ানন্দ, গোলাম দাস, বলরাম, বংশী, বাসুদেব দাস ও মেটেলার শ্রীপতি পাতর, ইসবপুরের লালা গণেশ, উল্লেখযোগ্য।



শুধু আন্দোলন নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। ১৯৪১ সালে অধ্যাপক নির্মলবাবু প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শিক্ষাগারের সঙ্গে খাদিভক্ত মিহিরলালের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এখানে একটি হরিজন বিদ্যালয়, একটি ছোট লাইব্রেরী ও একটি ছোট চরকাকেন্দ্র স্থাপন করেন। জেলার প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ প্রায়ই এই শিক্ষাগারে আসতেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, সুচেতা কৃপালিনী, পঞ্চানন বোস, অন্নদা চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রায়ই যাতায়াত করতেন। পরে বীরভূম জেলা-কংগ্রেস অফিস সিউড়ি হতে এই শিক্ষাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এই শিক্ষাগারের সভাপতি পদে মিহিরলালকে সব কর্মী পীড়াপীড়ি করলেও তিনি রাজী হয় নি। মিহিরলাল শুধু নিরলস কর্মী, কিন্তু পদলোভী ছিলেন না। এই শিক্ষাগারে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৪।১৫ টি চরকাকেন্দ্র স্থাপন করে খাদি কাপড় পড়ার প্রচার কার্য্যকে সফল করেছিল। শিক্ষাগারে জেলা কর্মীদের সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন, কংগ্রেসের সভ্যসংগ্রহ ও কংগ্রেস কমিটি গঠণের কাজ পুরোদমে চলেছিল। চরকা চালাবার খরচা বাবদ প্রতি রবিবারে ছাত্র ও শিক্ষকরা মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করত।

এই সময় মে মাসে ডাঃ ঘোষ তাঁতিপাড়ায় কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার জন্য মিহিরবাবু সঙ্গে কংগ্রেস অফিসে আসেন এবং জেলার স্বেচ্ছাসেবকদের এক সভার আয়োজন করেন। এই সভায় বাগ্মী ডাঃ ঘোষের জ্বালাময়ী বক্তৃতা এই এলাকার গ্রামবাসীদের ও কংগ্রেস কর্মীদের মুগ্ধ করেছিল এবং কংগ্রেস ও দেশের প্রতি জনগনকে অনুরাগী করেছিল। এ প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনা স্মরনীয়।

১৯৩০ সালে নেহেরু ২৬ শে জানুয়ারীকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে গন্য করলে দেশের সর্ব্বত্র এই দিনটি মহা সমারোহে পালিত হত। ১৯৪২ সালে বোলপুরের শিক্ষাগারেও এই দিনসটি ধূমধামের সহিত পালিত হয় যতীন সিংহ ও মিহিরলালের নেতৃত্বে। যতীনবাবু পতাকা উত্তোলন করেন। জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে মিহিরবাবু ও যতীনবাবু অভিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন মামলা চলার পর মামলা খারিজ হয়েছিল। এভাবে মিহিরলাল দুঃখ ও ত্যাগব্রত অবলম্বন করে দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে ন্যস্ত করে অটুট মনোবলের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র হিসাবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতে আসেন। তিনি কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক মিটমাটের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভারতে জাতীয় সরকার গঠনের কোন চেষ্টা না থাকায় ক্রীপস্ মিশন ব্যর্থ হয়। এই সময় "হরিজন" পত্রিকায় গান্ধিজী "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ফলে সারাভারতে গান্ধীজীর বানী চুম্বকের মতো কাজ করে। ৮ই আগস্ট বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের এক অধিবেশন আরম্ভ হল। মিহিরলাল এ, আই, সি, সি, র সভ্য হিসাবে বোম্বাই গিয়ে সভায় যোগদান করলেন। "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী, জহরলালজী, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ শীর্ষস্থানীর নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা পথিমধ্যে গ্রেপ্তার

হন। মিহিরলাল এই প্রস্তাবের ইস্তাহার বহন করে কলকাতায় এসে কংগ্রেস নেত্রী নেলী সেনগুপ্তার হাতে দেন। পরে কলকাতার ট্রাম গুমটিতে এক জন সভায় ভাষণ দিয়ে জাতীয়তা বাদী আন্দোলনর কথা চারিদিকে প্রচার করেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার একটি কাগজ বীরভূমের মাটিতে পৌঁছে দেবার জন্য আবেগ কণ্ঠে বলেন "কে আছ দেশ প্রেমিক! দেশবন্ধু। সত্যিই যদি দেশকে ভালবাস, তবে একখানি কাগজ বীরভূম কংগ্রেস অফিসে পৌঁছে দিও।"...এই কথা বলে তিনি আর একবার কারারুদ্ধ হলেন দমদম সেন্ট্রাল জেলে।

বীরভূমের নেতা লালবিহারী সিংহ এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে দুবরাজপুরে এক বিরাট জনসভা পরিচালনা করেন। তখন বড় বড় নেতারা জেলে বন্দী। তাঁতিপাড়ার মিহিরভক্ত, অমিয়ানন্দ দাস, বলরামরুজ, গোলাম দাস, বিপিন দাস ও কয়েকজন স্কুলের ছাত্র কারারুদ্ধ হন। এই ঘটনাগুলি মিহিরলালের জীবনের জ্বলন্ত দেশ প্রেম ও সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় আজও বহন করছে।

১৯৪৫ সালে নেতাজী সুভাষের আজাদহিন্দ বাহিনী পরাস্ত হল এবং সৈন্যদের বন্দী করা হল। এই সময় কলকাতায় আজাদহিন্দ সৈন্যদের মুক্তির দাবীতে ছাত্রেরা শোভাযাত্রা বের করেছিল। পুলিশ ছাত্রদের উপর নির্মম ভাবে গুলি চালায়। ফলে ৫৪ জন ছাত্র মারা যায় এবং ১৯২ জন আহত হয়। এই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতিবাদ কল্পে দেশের সর্ব্বত্র প্রতিবাদ মিছিল বের হয়েছিল। মিহিরবাবুর নেতৃত্বে সিউড়িতেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। কলকাতার এই ছাত্র হত্যার ব্যাপারে দারুণ হৈ চৈ পড়ে যায়। অবশ্য শান্তিকামী নেতৃবৃন্দের সহায়তায় উন্মত্ত জনতা শেষ পর্য্যন্ত শান্ত হয়েছিল। এই ঘটনার পর মিহিরলাল ও ডাঃ ঘোষের নেতৃত্বে বাপূজী গান্ধীকে রামপুরহাটে জনসভা করার জন্য আনা হয়েছিল। গান্ধীজী, বোলপুর শান্তিনিকেতন হয়ে রামপুরহাটে আসেন। ২০শে ডিসেম্বরে রামপুরহাট টাউন হলে বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মূর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেস কর্মীদের সভায় গান্ধীজী দীর্ঘ ভাষণ দেন। সত্যেনবাবু ১৯৪২ সালের আন্দোলনের রিপোর্ট গান্ধীজীর হাতে তুলে দেন। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঐ আন্দোলনে ৪৪২ জন দেশভক্ত গ্রেপ্তার বরন করেছিলেন, ১৪ জন আহত ও ২ জন নিহত হয়েছিল। বীরভূম জেলাবাসীর তরফ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের তহবিলে ২১ হাজার টাকার একটি তোড়া ভেট দেওয়া হয়েছিল গান্ধীজীকে। তিনি উক্ত টাকা বীরভূমের গঠনমূলক কাজে ব্যয় করার নির্দ্দেশ দিয়ে মিহিরলালের হাতে প্রত্যর্পণ করেন এবং পরে বীরভূমের নানা কল্যাণকর কাজে তিনি উক্ত টাকা ব্যয় করেন।

১৯৪৬ সালে মন্ত্রি মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার ও গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। জুন মাসে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। জুলাই মাসে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসকে জানালেন যে, শীঘ্রই অন্তবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। বড়লাট স্বয়ং এই সরকারের সভাপতি হবেন এবং জহরলাল নেহেরু উপ-সভাপতির পদ অলংকৃত করবেন।



সরকারের ছয়টি দপ্তর কংগ্রেসের হাতে থাকবে, পাঁচটি মুসলীম লীগ পাবে এবং বাকী ৩টি আসন অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন করা হবে। মুসলীম লীগের মনঃপুত না হওয়ায় এইদিন অন্তবর্তী সরকারে যোগদান করতে অস্বীকার করে। লীগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি না পেয়ে উন্নত হয়ে ওঠে এবং জেহাদ ঘোষনা করে ১৬ই আগস্ট কলকাতায় রক্তক্ষয়ী নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে ।

১৯৪৬ সাল বাংলার ইতিহাসে এক ভয়াবহ অশুভ বছর। ইংরেজ সরকারের বিভেদনীতির ফলে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানদের বোঝাবুঝির দোষে এক বিরাট হাঙ্গামা সুরু হয়। শেষে এটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়। কলকাতায় হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান নরনারী, শিশু বৃদ্ধ খুন হতে থাকে। শেষে নোয়াখালি জেলায় মুসলীম লীগ এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দারুনভাবে সুরু করে। মহাত্মাজী ছুটে গেলেন পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবার মানসে। হিন্দুরা প্রাণভয়ে কাতারে কাতারে দেশত্যাগ করতে লাগলো। মিহিরলাল ও পাইকরের তারা চরণ ব্যানার্জী বীরভূম থেকে নোয়াখালি রওনা হলেন। যাবার পথে কলকাতায় জনৈক হিন্দু মহা সভার প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁকে বলেন "বীরভূমে পাঁচ হাজার বিপন্ন হিন্দু পরিবারকে তিনি পুনর্বাসন করতে প্রস্তুত।" ঐ নেতার মারফৎ এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে গেল। নোয়াখালি জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে মহাত্মাজীর সঙ্গে মিহিরলালের দেখা হয়। তাঁকে প্রনাম করা মাত্রই মাহাত্মাজী জিজ্ঞেস করলেন। "মিহির! তুমি নাকি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি না নিয়ে পুনর্বাসনের বিবৃতি দিয়েছ।" সরল বিশ্বাসী মিহিরলাল নিজের ভুল বুঝতে পেরে সংঝমী হলেন, এটা দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করলেন। পরক্ষণেই গান্ধীজী মিহিরের গায়ে তসরের জামা দেখে সহাস্যে বললেন—"তুমি তসর পরেছ কেন? এ তো বড়লোকের পোষাক" তেজস্বী মিহির বললেন—"কাপড়টা দামী বটে, কিন্তু এটা তাঁতিপাড়ার তাঁতশিল্পীদের হাতে বোনা।" ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁতিপাড়ায় তিন দিন থেকে তাঁদের দুরবস্থার পরিচয় পেয়েছেন। মহাত্মাজী খুশী হয়ে সহাস্যে বললেন—"বেশ। বেশ ভালকথা। তাঁতিপাড়ার তাঁতশিল্পীরা যাতে জীবিকা অর্জনের মত ন্যায্য মজুরী পায়। সেটা তোমাকে দেখতে হবে।"

এদিকে ২রা সেপ্টেম্বর জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সরকারের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নেহেরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, শরৎ বসু ইত্যাদি। মুসলীম লীগ অক্টোবরে বড়লাটের অনুরোধে সরকারের পক্ষে যোগদান করলেও তাদের উদ্দেশ্যেও মনোভাব শুভ ছিল না; বরং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রে বার্বাদান করাই ছিল তাদের কুট উদ্দেশ্য এবং তারা গণ পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। বীরভূমের সিউড়ি কেন্দ্র থেকে মিহিরলাল সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়ে কংগ্রেস সরকার পক্ষে

যোগদান করেন। কিন্তু এই পদে বেশীদিন তিনি ছিলেন না। দেশের স্বার্থে লোভ সংবরণ করে ঐ পদ পরিত্যাগ করেন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে এই আসনে নির্ব্বাচিত করার জন্য। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সুযোগ লাভ করেন ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের অপেক্ষা দেশের স্বার্থ কত বড়—মিহিরলালের এই ত্যাগ স্বীকার তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। এদিকে মন্ত্রী মিশনের সিদ্ধান্তমত ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মুসলীম লীগ যোগদান করলো না। তবু অধিবেশন আরম্ভ হল। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই সভার অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত হলেন। কিন্তু মুসলীম লীগ কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় মেতে উঠলো। ইংরেজ সরকারও উস্কানি দিতে দ্বিধাবোধ করল না। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। ভারত স্বাধীন হলো, কিন্তু ভারত'দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী গণপরিষদ সংবিধান রচনার কাজ শেষ করায় ভারত একটি সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হল। এই পরিষদের সদস্য হিসেবে মিহিরলালও সংবিধান রচনার সভায় যোগদান করার পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। এই সময় কাশ্মীর ভারতের সংযুক্তি সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমন করে। সেখানে গণ-ভোট গ্রহণের ঠিকমত পরিস্থিতি আছে কিনা এ বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য মিহিরলালকে কাশ্মীরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। তখন কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার বিরোধী নেতা পি, এন্, ডোগরা মিহিরলালকে আমন্ত্রণ জানালেন কাশ্মীরে গিয়ে সরজামিনে তদন্ত করার জন্য। ডাঃ রঘুবীর সহ মিহিরলাল গেলেন। ফিরে এসে মিহিরলাল একটি গোপন রিপোর্ট লিখলেন ?

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও সমাজতন্ত্রী আদর্শ প্রচার করা হত। জহরলাল নেহেরু ও সুভাষ বসু জঙ্গী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি প্রকাশ্যে ঘোষনা করেন সমাজতন্ত্রই কংগ্রেসের লক্ষ্য। তাঁর অভিমত ছিল কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও শহরাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ১৯৩৪ সালে জয়প্রকাশ নারায়ন, নরেন্দ্রদেব প্রমুখদের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। অপর দিকে বেআইনী অবস্থায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সুসংহত হতে থাকে, কারাগারে বন্দী বিপ্লবীরা সাম্যবাদী ও গণ আন্দোলনের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই সবদল অগ্রনী ভূমিকা নেওয়ায় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ফলে স্বাধীনতার আন্দোলন শুধু সমাজের উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রামে গঞ্জে, মাঠে ও কারখানায় প্রসারিত হয়। এই সব আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়েছিল মিহিরলালের জীবনে। তারই পরিচয় আছে তাঁর কর্মধারায়। স্বাধীনতার পর সমাজবাদী নেতা মিহিরলাল ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত পার্লামেন্টের সদস্য থাকাকালীন বীরভূমের কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৯৩৯ সালে তাঁতিপাড়া গ্রামে তন্ত প্রধান শিল্প বিকাশে তন্তুবায় সমবায় সমিতি ও হরিজন প্রধান পল্লীতে চর্ম্ম শিল্প



বিকাশ সমিতি গঠন করে শ্রমিকদের মধ্যে নব চেতনা ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে নানা কারণে, মতানৈক্য ঘটায় তিনি আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবর্গের সাথে কংগ্রেস ত্যাগ করে "কৃষক মজদুর সভা" দলে নিজেকে যুক্ত করেন। দু'বছর পর এই দল অন্য একটি সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রজা সোসালিস্ট পার্টিতে পরিণত হয়। মিহিরলাল এই দলের সদস্য হিসেবে ১৯৫৭ সালে কুঁড়েঘর ছাপ নিয়ে সিউড়ি কেন্দ্র থেকে বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং বীরভূমের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় নিজেকে বিরোধী দল ভুক্ত করেন।

১৯৬৭ পর্য্যন্ত তিনি এই দলের সদস্য হিসাবে কাজ করেন এবং পরে সপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ত্যাগ করে পুরোপুরি গান্ধীবাদী সমাজ বন্ধু হিসেবে বীরভূম তথা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হন। ১৯৫৭ সালে 'ভোট প্রার্থনা' পুস্তিকায় তাঁর বক্তব্য অনুসারে মিহিরলালের সমাজ ও দেশ সেবার আদর্শ ও বানী স্মরণীয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচণের জন্য সিউড়ি কেন্দ্রে তিনি পদ প্রার্থী। তাঁর বক্তব্য—"আমি এই এলাকা হইতে পার্থী হিসাবে দাঁড়াইতে চাই। এই এলাকার বহু লোকের সহিত আমার পরিচয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আমার জন সেবার কথা, কাজ করিবার স্বভাব এবং জনগণের সহিত আমার দৈনন্দিন আচরণের কথা জানেন। বহুদিন পূর্বে তাঁতিপাড়া গ্রামে আমার আগমনের পর হইতে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার দেশ সেবার কথা, গ্রাম উন্নয়নের কাজে জেলার বিভিন্ন থানায় আমার সাধ্যানুযায়ী গঠনমূলক জনহিতকর কাজের কথা, অনেক এলাকায় জনগণের পরিচিত।

আমি এই কথা বলিতে পারি যে, দীর্ঘ কাল যাবৎ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপেক্ষা সর্ব্ব-সাধারণের সকল প্রকার প্রয়োজনে আমি আমার অধিকাংশ সময় নিয়োগ করি, এবং জেলার যে কোন স্থানের জনগণের কোন সমস্যার কথা জানিতে পারিলে আমি তাহা নিজের সমস্যা বলিয়া মনে করি ও প্রতিকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি। এই জেলার যেখানে যখন যেরূপ প্রয়োজন, জনগণ সম্ভবতঃ এক বৎসর যাবৎ সেই কাজে আমাকে বরাবরই পাইয়াছেন। মুরারই, নলহাটি, মল্লারপুর, সাঁইথিয়া, কড়িধ্যা, তাঁতিপাড়া, রাজনগর, দুবরাজপুর, ইলামবাজার, বোলপুর, খয়ড়াশোল প্রভৃতি ইউনিয়ানে একদিন জনগণকে লইয়া আমি যেমন ম্যালেরিয়া নিবারণের সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী ডি-ডি-টি অভিযানে লাগিয়াছিলাম ( সরকার পরে এই জেলায় কাজটি গ্রহণ করেন ), সেইরূপ কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার সরকার এবং বাংলা সরকারের সহিত বহুপূর্বে যোগাযোগ পূর্বক "ময়ূরাক্ষী" পরিকল্পনা মঞ্জুর করানোর জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তৎকালীন বিহার সরকারের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী বিনোদানন্দ ঝার সাথে মিলিত হয়ে বিহারের মশান জোড় জলাধার যাতে নির্মিত হয় তার সুবন্দোবস্ত করেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আনুকুল্যে তাঁর চিন্তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে আরও প্রকাশিত "ইংরাজ

আমলে মুরারই থানায় কাঁহিনগর, বেলিয়া, পলশা প্রভৃতি গ্রামে, ময়ূরেশ্বর থানার গনুটিয়ার নিকট ক্যানেল কাটিয়া নদীর জলে সেচের ব্যবস্থা, লাভপুর থানায় কুয়ে নদীর বাঁধ সংস্কার পূর্বক গ্রাম ও জমি রক্ষার প্রচেষ্টা, বীরভূম জেলায় আমার প্রথম জীবনের জনসেবার পরিচয়।” “জনগন আমাকে ভোটের দ্বারা বিধান সভায় একবার পাঠাইয়াছিলেন—সেখানে আমি এই জেলার এমন কোন প্রধান সমস্যা নাই, যাহার কথা উত্থাপন করি নাই।

বীরভূমকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে “চলতা” ও “ঈশ্বরবৃত্তি বন্ধের জন্য দাবী উত্থাপনের প্রত্যেকটি সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছি—চাষী ও গৃহস্থের কল্যাণে। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট নতুন আইনের মধ্যে আমার প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন প্রনয়ণের ব্যাপারে আমার কত প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন, সিউড়ি আদালতের আইন ব্যবসায়ীগণ তাহা জানেন। বস্তুত পক্ষে আমি গঠণ মূলক লোকহিতকর কাজে বিশ্বাসী মানুষ—বিধান সভার সদস্যপদে থাকিলে জনহিতকর কাজ করিবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। এই জেলায় ভীমগড় হইতে পলাশথলী রেল লাইনে প্রায় ২৫ বৎসর কোন যাত্রীবাহী ট্রেন চলিত না। আমি লোকসভার সদস্য থাকা কালে, সরকার ও উচ্চতম সরকারী কর্মচারী দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হওয়ার ঐ ব্রাঞ্চ লাইনে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচল সুরু হয়। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা মঞ্জুরীর কাজে আইন সভায় আমার সদস্যপদ আমাকে প্রভূত পরিমানে সাহায্য করিয়াছে। সম্প্রতি জানুগঙ্গায় চারটি ইলেট্রিক পাম্পে প্রায় ২৫ ফুট উর্দ্ধে ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের জল তুলিয়া সিউড়ি সহরের সন্নিকটে ৪০০০ বিঘা জমি বার মাস সেচের যে নতুন দৃষ্টান্ত এই বীরভূম জেলায় প্রথম স্থাপিত হইয়াছে বিধান সভার সদস্য থাকার জন্য উহা অনেক পরিমানে সম্ভবপর হইয়াছে। সিউড়ি শহরে কলের জলের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য তিলপাড়া ব্রীজের নিকট সীতামারী খালের সহিত ময়ূরাক্ষী মেন ক্যানেলের সংযোগ সাধনে সিউড়ি মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাব আমি কত ঐকান্তিকতা ও নিশ্বস্ততার সহিত সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীর চেষ্টা করিয়াছি। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিলে বিধান সভার বিরোধীপক্ষের সদস্য ও বহু জনহিতকর কাজ করিতে পারেন এবং বহু সৎ সরকারী কর্মচারী এমন কি, মন্ত্রীরাও বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তির সৎকার্য্যে অনেক সময় সহায় হন। “আমি সরকারের জো-হুকুম। হাত-তোলা দলের লোক নহি, এবং বিধান সভায় এই জেলা হইতে সরকারের পক্ষে হাত তুলিবার লোক পাঠাইবার বিরোধী। আমি সমাজে বিশৃঙ্খলা, উপদ্রব, অরাজকতা সৃষ্টিকারী কোনও দলের লোক নহি। আমি বিশ্বাস করি, গ্রাম্য সমাজে শান্তি, সদ্ভাব, সখ্য এবং ঐক্য ব্যতীত কৃষি প্রধান পল্লীজীবনে চাষী ও মজুর শ্রেণীর যৌথ কল্যাণ হইতে পারে না।” এভাবে মানবদরদী মিহিরলাল ১৯৫৭-৬২ সাল পর্য্যন্ত বিধান সভার সদস্য হিসেবে জনগণের অশেষ কল্যাণ যথাসাধ্য করেগেছেন। ইংরেজ আমলেও একদিন তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁর যৌবন-কাল অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি বিধান সভার ও বিধান সভার বাইরে সেচের জলকর একরে দশ টাকার পরিবর্তে



৫ টাকা করার জন্য এবং ক্যানালের সুবিধা বিভিন্ন এলাকায় আরও বিস্তারের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উচ্চমূল্যের তুলনায় চাষীর উৎপন্ন ধানের দাম কম হলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতেন।

১৯৫৮ সালের একটি ঘটনা কৃষকবন্ধু মিহিরলালের কর্ম প্রচেষ্টার নিদর্শন রূপে স্মরণীয়। ময়ূরাক্ষী ক্যানেলে জল ছাড়া হয়েছে। নর্থব্রাঞ্চ ডিভিশানে খয়ড়াকুড়ি হতে ডেউচা পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি এলাকায় ক্যানেলের সেচ সরবরাহ করা হল না। স্থানীয় চাষীরা প্রতিকারের জন্য মিহিরলালের দ্বারস্থ হল। তিনি সেচবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যোগাযোগ করলেন। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বললেন “বাঁধের মুখে জলের চাপ এত বেশী যে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে পাইপ দিয়ে জল ছাড়লে বাঁধ ভাঙতে পারে। জমি জলের তলায় ডুবে যেতে পারে এমন কি গ্রাম সংলগ্ন মাটির ঘর ধ্বসে পড়তে পারে। তাছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ ব্যবস্থা নাই। কাজেই ক্যানেলের জল সরবরাহ করা হবে না।” চাষীদের স্বার্থে মিহিরবাবু শতাধিক কৃষক নিয়ে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ফলে বঞ্চিত এলাকায় পাইপ দিয়ে জল সরবরাহ করার অনুমতি লাভ হয়। পরহিত ব্রাত উৎগর্সীকৃত প্রাণ মিহিরলালের জয়গান সূচিত হল। তাঁর জীবনের আর একটি ঘটনা স্মরণীয়। ১৯৫৭-৬২ সালে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নির্দ্দেশে সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ একটি পঞ্চায়েতি রাজ ও সমষ্টি উন্নয়ন পর্যাবেক্ষকদল গঠন করেন। সরকার পক্ষের সদস্য ছাড়াও বিরোধী দলের দু'জন সদস্য নেওয়া হয়েছিল। বিরোধী পক্ষের তরফে তিনি অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। এই পর্য্যাবেক্ষকদলের প্রতিবিদানের উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বপ্রথম পঞ্চায়েত আইন পাস হয় এবং পরে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় শিক্ষাব্রতী মিহিরলালের অদম্য উৎসাহ দেখা যায় বিভিন্ন স্থানের উন্নতিকল্পে। ১৯৫৮ সালে সিউড়ি আর, টি, গার্লস হাইস্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত করার ব্যাপারে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সহিত যোগাযোগ করেন এবং সফল হন। ১৯৩৯ সালে তাঁতিপাড়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমৃত্যু বিদ্যালয়ের উন্নতি কামনা করতেন। তাঁতিপাড়ায় তাঁরই উদ্যোগে মেয়েদের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বিরাজমোহিনী কন্যা শিক্ষালয় এবং ১৯৬৪ সালে তাঁতিপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যলয়ের উন্নয়ন ব্যাপারে মিহিরলালের প্রচেষ্টার অবদান ও কম নয়। এই বিদ্যালয়ের গৃহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এক বিঘা জমিও দান করেন। ইলামবাজার বিদ্যালয় গঠনেও তাঁর অনলস প্রশংসার দাবী রাখে। এভাবে কর্মযোগী মিহিরলাল দেশসেবায় পরিপূরক শিক্ষা প্রসার, জাতিভেদ ও অপৃশ্যতা দূরীকরণ, মাদকদ্রব্য বর্জন, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নতি ইত্যাদি মহৎ কাজের প্রচেষ্টা চালিয়ে দেশ প্রেমিকের আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে ধন্য হয়েছেন এবং মানুষকেও গভীরভাবে অনুপ্রানিত করেছেন।

১৯৬২ সালের কথা। আবার বিধান সভার নির্ব্বাচন এল। মিহিরবাবু এবারও বিরোধী

দলের সেবক হিসেবে সিউড়ি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে ভোট-প্রার্থী হলেন। কিন্তু জনগন সেবাব্রতী মিহিরলালের আদর্শ ও বানী ভুলে গেল। নির্ব্বাচনে পরাজয় ঘটল। কিন্তু অটুট মনোবলের অধিকারী তপস্বী মিহিরলাল জয় পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। জনগণের রায়কে সাদরে বরণ করে দ্বিগুণ উৎসাহে দেশসেবায় নামলেন। এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়। নির্ব্বাচনের ফল ঘোষণার কয়েকদিন পরে প্রফুল্ল চিত্ত মিহিরলাল টেবিলে বসে লেখাপড়া করছিলেন। বেলা আড়াইটা কি তিনটে হবে। হঠাৎ বাড়ীর পিছনের বস্তী থেকে "আগুন" "আগুন" চিৎকার শোনা গেল। চীৎকার শুনে বেরিয়ে এলেন। ধোঁয়া, চীৎকার, আর্তনাদ সব মিলিয়ে একটা ভয়ার্ত অবস্থার চিত্র। তিনি ছুটে গেলেন বস্তির দিকে। গোয়াল ঘরে আগুন লেগেছে। ভয়ার্ত গুরুগুলি চিৎকার করছে। জ্বলন্ত গোয়ালে ঢুকে গুরুলিকে বাঁধন মুক্ত করলেন সর্বপ্রথম তিনিই। ঘণ্টাদুই পর কালিমাখা অবস্থায় নিজের আস্তানায় ফিরলেন মিহিরলাল। পরদিন ঐ বস্তির একজন মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল—"আমরা কি ভুল করেছি, বাবু! এমন মানুষকে আমরা ভোট দিলাম না। যাদের দিয়েছি তাদের তো কেউ এলো না।" উত্তরে স্মিতহাস্যে মিহিরলাল শুধু বললেন "আমার ধর্ম আমি করি।" কী অমায়িক, নির্বিকার মানুষ ছিলেন মিহির-লাল। মিহিরলালের মা প্রায়ই চিঠিতে লিখতেন "তুই আমার সাদা পোষাকের সন্ন্যাসী ছেলে"—কথাটা কত বড় সত্যি—এই ঘটনাটি তারই এক জীবন্ত আলেখ্য। এই সময়ে মিহিরলাল কৃষক কল্যাণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সেচব্যবস্থার উন্নতি করেন। সরকারী সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি, এগুলো রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য। একবার সিউড়ির এক পরিচিত ছেলে যাকে মিহিরলাল খুব স্নেহ করতেন, হঠাৎ দেখলেন ছেলেটি ইঁট দিয়ে রাস্তার লাইটের বালব্ ভাঙ্গছে। তিনি ছেলেটিকে ধরে নিয়ে ত্রাস প্রচণ্ড ভৎর্সনা করলেন। তিনি ভুলে গেলেন ব্যক্তিগত পরিচিতি, স্নেহের বন্ধন। এমনিই ছিল তাঁর স্বভাব ধর্ম। সরকারী সম্পত্তি কারও নষ্ট করা উচিত নয়—এই শিক্ষা দিয়ে ছেলেটিকে মানুষ করিলেন। আজকাল সরকারী সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে অনেকেই বাড়ী নিয়ে আসে, রাস্তা ঘাট নষ্ট করে, বাজারে বিক্রী করে। তবু কোন সরকারী প্রতিনিধি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহসী হন না, বা অপ্রিয় হতে চান না। মিহির-লাল জানতেন অন্যায় করা অন্যায় সহ্যকরা দুইই সমান দোষের।

১৯৬৪ সাল। ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া পুলের রাস্তার উপর সরকার কর্ত্তৃক মানুষ চলাচলের জন্য টোলট্যাক্স্ (সাইকেল ৬ন, প, রিক্সা ১০ন, প, গো-গাড়ী ৩১ ন, প,) ধার্য্য করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিনে এই ধরনের টোল-ট্যাক্স্ অতীব অযৌক্তিক ও অন্যাহ্য এবং অসহ্য ভেবে মিহিরলাল সিউড়ি থেকে সাইকেল যোগে মহম্মদ বাজার গিয়ে আইন অমান্য করেন। পরে স্বাধীনতা দিবসের দিন সরকার ঐ ট্যাক্স্ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। তাছাড়া গ্রামীন অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠনে মিহিরলাল গ্রামীন কুটির শিল্পগুলির বিকাশের জন্য নানা-



ভাবে চিন্তা করতেন। শুধু তাঁত ও চর্মশিল্প নয়, খেজুর ও তালগাছের রস থেকে শ্রমিক ভাইরা যাতে গুড় তৈরী করে লাভবান হতে পারে প্রচেষ্টা তাঁর জীবনের ঘটনা প্রবাহে দুর্লভ নয়। বীরভূম জেলায় যাতে এই শিল্পের বিকাশ ঘটে তারজন্য তিনি একবার পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

তালগুড় প্রসারের জন্য 'খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রীজ' এর কমিশনের কাছেও দরবার করেছিলেন। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করছে। তাঁতিপাড়া স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক বগলাপদ মণ্ডলের সাথে যোগাযোগ করে 'সাহাপুর' গ্রামে তিনি একটি তালগুড় তৈরীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেন। নদীর তীরে প্রায় ৫০০ তালগাছ দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য, চৈত্র মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত যখন চাষ-আবাদের কোন কাজ থাকে না, তখন ক্ষেতমজুররা এই কাজ করে সংসারের আয় বাড়তে পারবে। ১ জন লোককে ৫টি করে গাছ দেওয়া হয়। গাছের মালিককে ১্ টাকা দিয়ে খরচ বাদে তার দৈনিক ৮ টাকার মত রোজগার হবে। পশ্চিমবঙ্গ খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীমতী পূরবী মুখাজ্জীর সাথে যোগাযোগ করে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়েছিল। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ১৫-২০ জন করে ক্ষেতমজুর এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিতে আসত। তত্ত্বাধায়ক ছিলেন ৺জগবন্ধু মণ্ডল। কিন্তু তালগুড় তৈরীর চাহিদা ও বাজার থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন মূল্য লাভ জনক না হওয়ায় কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। মিহিরবাবু কলকাতা থেকে আগত প্রশিক্ষণ সহ নিজে তাঁতিপাড়া থেকে সাহাপুর যেতেন কর্মীদের উৎসাহ দেবার জন্য। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'ময়ূরাক্ষী' পত্রিকায় এই কেন্দ্রের কার্যাদি প্রচারের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। মুরারই, রামপুরহাট অঞ্চলেও এই তালগুড় তৈরীর প্রচেষ্টা তিনি বীরভূমবাসীর কল্যানার্থে চালু করেছিলেন। বীরভূম বন্ধু মিহিরলালের সমাজসেবার আদর্শ ও পরিকল্পনা কত সহজ ও মহৎ ছিল—এই ঘটনাগুলি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৬৮ সালে সরকার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন আমোদপুর সুগার মিলটি নিলামে বিক্রী করা হবে। মিলটি মাদ্রাজে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। বীরভূমের চাষী সম্প্রদায়ের তথা জনগণের সমূহ ক্ষতি বিবেচনার "ময়ূরাক্ষী" পত্রিকায় তিনি প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। আমোদপুরের ডাঃ তারাপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে গঠিত সুগারমিল স্থানান্তর প্রতিরোধ কমিটি বাধার সৃষ্টি করে। তখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন—রাজ্যপাল ধরমবীর। নতুন মন্ত্রীসভা এই চিনিকল চালাবার দায়িত্ব নিল, কিন্তু পাহাড় প্রমান লোকসান হওয়ায় আরও সংকট দেখা দিল। মিহিরলাল ময়ূরাক্ষী পত্রিকায় লিখলেন—'বাঁদরের গলায় মুক্তাহার শোভা পায় না, ছাগল দিয়ে জমি চাষ হয় না।' কাজেই সুদক্ষ শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর হাতে মিলের দায়িত্ব দিলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পখ্যাতি বাড়বে, বৈ কমবে না। কর্মচারী ছাঁটাই করতে হবে না, নতুন কর্মচারী কাজ পাবে, চাষী বন্ধুরাও উপকৃত হবে। সাংবাদিক হিসাবে মিহিরলালের কথা একটু বলা যাক।

১৯৫৩ সালে তিনি সাপ্তাহিক 'ময়ূরাক্ষী' পত্রিকা নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করতেন। দু'বছর

তিনি এইপদে আসীন ছিলেন। ১৯৬৬ সালে কলকাতার জনৈক ধণাঢ্য ব্যক্তির অর্থদানের প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি সাপ্তাহিক ময়ূরাক্ষীকে দৈনিক ময়ূরাক্ষী পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন। এই পত্রিকা স্টেশনে বাক্স মধ্যে রেখে বলেছিলেন—"নিজ হাতে পয়সা দিয়ে পত্রিকা নিন্ এবং পড়ুন।" স্বাধীন দেশের মানুষের সততা পরীক্ষা করার মানসে তিনি এই ব্যবস্থা নেন। দিনের শেষে দেখা যেত, কাগজ শেষ, কিন্তু পয়সা কম, বেশীরভাগ থাকতো হাঁড়িভাঙ্গার কুচি, পাথর ইত্যাদি। মনে মনে তিনি আপষোশ করতেন 'হায়রে দুর্ভাগা দেশ!' স্বাধীন দেশের মানুষের সততা না থাকলে দেশের অগ্রগতি হবে কি করে? এই ঘটনা মানুষকে বুঝিয়ে দেয় স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বাধীন ভারতের টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পেও মিহিরলাল সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৫৬ সালে শিয়ালদহ স্টেশনের টেলিফোন ব্যবস্থা অচল হলে তিনি কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সহিত যোগাযোগ করেন এবং এই বিভাগের সন্তোষজনক উন্নতি ঘটাল। সিউড়ি বর্দ্ধমান ট্রাঙ্ক লাইন করার ব্যাপারেও তাঁর অবদান আছে। কর্মবীর মিহিরলালের কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে এ, আই, টি, ইউ, কমিটি তাঁকে ১৯৫০-৫১ সালে সর্ব সামতিক্রমে ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত করে। কিন্তু সভাব সিদ্ধ নির্লোভ মিহিরলাল তাঁদের আশা পূরণ করতে পারেনি; কারণ তিনি পদের মোহ ছেড়ে কর্ম সম্পাদন বেশী পছন্দ করতেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু জীবনের কর্ম অনন্ত।

১৯৪০ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (পূর্বাঞ্চল স্তরে) প্রতিষ্ঠিত আদিম শবর জাতীয় সভার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ছিল ঘাটশিলা (সিংভূম) বিহার, শাখাকেন্দ্র বেলপাহাড়ী (মেদিনীপুর), বাদাম পাহাড় (ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যা। চারিযুগেই সাহিত্য, পুরাণ, কাব্যে এই শবর জাতির পরিচয় মেলে। বিভিন্ন মনুষ্য শাখা প্রশাখার বিবিধ রূপের মাধ্যমে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু সৃষ্টির উষাকালে যে ভাবে এই শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, অগ্রগামী যুগেও শবর জাতি একই রকম পশ্চাৎপদ রয়েছে। তাদের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক উন্নতিকল্পেও মিহিরলাল নিরলস কর্মী ছিলেন এবং এই ধরণের সংগঠনকার প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রেখে চিন্তাভাবনা করতেন। এই সময়ে ময়ূরাক্ষী সেচ সমবায় সমিতির কার্য্যকলাপের সঙ্গেও তিনি অনলস কর্মীরূপে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এই কমিটির সভাপতিও ছিলেন তিনি। তারপর ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন জেলার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে একটি "পেনসন মঞ্জুরী" বিভাগ গঠন করেন। এই বিভাগের সদস্যবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে আবেদনকারীদের দরখাস্ত পরীক্ষা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। বীরভূম জেলার কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসাবে মিহিরলাল সম্মানিত হয়েছিলেন। টিপসহি দিতে বলে প্রথমে স্বাধীনতা সংগ্রামী মিহিরলাল পেন্সন্ নিতে অস্বীকার করেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক জনমতগঠনে তৎপর হন এবং টিপসহি প্রথা খারিজ করার জন্য তদানীন্তন এম, পি সমরগুহকে দিয়ে পার্লামেন্টে বিষয়টি উত্থাপন করান, পরে এই প্রথা লোপ পাওয়ার পর সকলের অনুরোধ তিনি পেন্সন্ গ্রহণ করেন। পাঁচজন সদস্যের অন্যতম নগরীর শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায় নানাভাবে মিহিরলালকে সাহায্য করতেন।



জীবন প্রবাহের ধারায় সেবাব্রতী মিহিরলালেরও কর্মযোগের পথ পরিবর্ত্তিত হল। ১৯৬৯ সাল থেকে আমৃত্যু স্বাধীনতা সংগ্রামী মিহিরলাল প্রত্যক্ষ রাজনীতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমাজ সেবার আদর্শে যুক্ত করলেন। বেদ্ বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, মহাত্মাজীর জীবনকথা ইত্যাদি বিষয়ে নানা শাস্ত্রজ্ঞ মিহিরলাল সমাজবাদী জীবন রসিক গান্ধীবাদী মানব প্রেমিকে রূপান্তরিত হলেন। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, হিন্দুস্থানী চারিটি ভাষা ছিল তাঁর অধিগত। ভারত-পথিক মিহিরলাল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভ্রমণকারী রূপে জীবনের পথে নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, নানা ভাষা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি পোশাক পরিচ্ছদের সাথে পরিচয় ঘটিয়েছেন এভাবে ভূয়োদর্শী মিহিরলাল মানব জীবনের মূলকথা "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে আজীবন মনস্থ করেছিলেন। তাঁর তেজোদীপ্ত বাক্ভঙ্গীমা সকলকেই মুগ্ধ করত। রবীন্দ্রনাথের 'গুরু গোবিন্দ', 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাদ্বয় তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। উদাত্তকণ্ঠে এই দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করতে তিনি এতটুকু পরিশ্রম বোধ করতেন না।

কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে বক্তা মিহিরলালকে মনে হয়েছে তিনি একজন দক্ষ কৃষক বা দক্ষ শ্রমিক। যখন তিনি চর্মকারদের কাঁধে হাত রেখে সমাজ সেবার কথা বলেন, তখন মনে হয় তিনি হিন্দু নন্, মুসলমান নন্, চর্মকার নন্, তিনি কেবল মাত্র মানুষ। স্বাধীনতার পর অনেক দেশ নেতা হরেক রকম অশোভন, অবাঞ্ছিত অসংস্কৃত কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছেন, কিন্তু মিহিরলালের চরিত্র তাঁর পরিধেয় শুভ্র খদ্দরের মতোই সদা পবিত্র, নিষ্কলুষ ছিল। সেবাব্রতী সংগ্রামী জীবন নিয়ে পথচলা সুরু করে দীর্ঘ ৮৫ বছর একটানা পরার্থে জীবনদান করে সম্পাদিত সেবাকর্ম মিহিরলালের মহাজীবনের জয়গান ঘোষিত করেছে। তাঁর শেষ জীবন "জন সেবা" প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানা সৎকর্ম অনুষ্ঠানে আনন্দে মুখে শান্তিতে কেটে গেছে তাঁতিপাড়া বাসভবনেই। এই প্রসঙ্গে জনসেবা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বিবৃত করে তাঁর শেষ জীবনের কর্মধারার মূল্যায়ন সমাপ্ত হবে।



৫

## ॥ চতুর্থ পর্ব ॥

১৯৬৯ সালের এক সোনালী দুপুরে বক্রেশ্বর হতে তাঁতিপাড়ার হাটের দিকে এক বৃদ্ধপ্রায় মানুষ হেঁটে আসছেন, সেই সময় মিহিরবাবুর তাঁর বারান্দায় বসে তাঁকে দেখতে পেয়ে দূর হতে ডেকে ওঠেন—"যোগেনবাবু"—"যোগেনবাবু"। রোগা দুর্বল চেহারা শ্রী:যোগেন্দ্র কিশোর দাস এম, এ, এল-এল-বি (৺মহেশ ভট্টাচার্য্য হোমিওপ্যাথিক কোম্পানীর জেনালের ম্যানেজার) মিহিরবাবুর দিকে এগিয়ে আসতেই মিহিরবাবু তাঁকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এসে চেয়ার বসান। মিহিরবাবুর কুমিল্লা জীবনের এক অতি পরিচিত মানুষ যোগেনবাবু। যোগেনবাবুকে এতকাল পরে পেয়ে তিনি হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। যোগেনবাবুরও মনে পড়লো কুমিল্লায় এক সময় মিহির-বাবুরা মুষ্টিভিক্ষার সংগ্রহের মাধ্যমে সেখানে অভয় আশ্রমের কর্মীহিসেবে একটি দাতব্য হাসপাতাল চালাতেন; আর ঐ কাজে স্বনামধন্য ৺মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৫টি বেড চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই দু'জনের পরিচয়। স্মৃতির নটভূমিতে দাঁড়িয়ে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আবার গঠন মূলক কাজের আলোচনায় সময় কাটে। এই আলোচনার ফসল হিসাবে বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্ম-সম্ভাবণা সুরু হয়। যোগেনবাবু প্রতিষ্ঠানটির নিয়মাবলী তৈরী করা, সোসাইটি আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করানোর দায় দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। মিহিরবাবুও তাঁর তাঁতিপাড়ার জায়গা-জমি এই প্রস্তাবিত সেবামূলক কাজের জন্য দান করবেন। তাই যোগেনবাবু একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন করারও চিন্তা করেন। এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটির জন্য মুহূর্তে তিনি তাঁর স্থানীয় অনুগামীদের ডাক দিলেন এবং আলোচনার সমগ্র বিষয় বস্তু তুলে ধরলেন। উদার হৃদয় যোগেনবাবুও বলেন—"এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হবে তাঁতিপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় চালানো" যোগেনবাবু তখনও ৺মহেশ ভট্টাচার্য্য হোমিওপ্যাথিক কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত। কাজ প্রেমিক যোগেনবাবু বললেন "যতদিন বাঁচবো, এই চিকিৎসালয়টির যাবতীয় হোমিও ঔষুধ এবং সুগার যা দরকার, আমি তা বিনামূল্য দেব। "১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারী বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় "মহেশ ভট্টাচার্য্য দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়" নামে একটি দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় জনসেবার কাজ আরম্ভ করলো। বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠান গঠনে অভিলাষী হয়ে যাঁরা প্রথম স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন (১) ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসক (২) শ্রীগৌর কিশোর দাস, অধ্যাপক (৩) শ্রীকালীপদ দাশ, শিক্ষক (৪) শ্রীসুনীল দাশ, তন্তুবায় (৫) শ্রীসত্যপ্রসন্ন দাস, শিক্ষক এবং রেজিস্টার্ড হোমিওপ্যাথ (৬) শ্রীমহাদেব দাস, ব্যবসায়ী (৭) শ্রীশশাংক শেখর গুঁই, ব্যবসায়ী (৮) শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর দাশ, ম্যানেজার, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং (৯) শ্রীমিহির লাল চ্যাটার্জ্জী, জনসেবক। এই প্রতিষ্ঠানটি ২৯. ১. ৭৩ তারিখে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত হওয়ার পর পরই ২৯.১.৭৩ তারিখে মিহিরবাবু তাঁতিপাড়ার



সমগ্র জায়গা-জমি বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানকে একটি রেজিষ্ট্রী দলিলমূলে নিঃসর্ত্ত ভাবে দান করেন। চিকিৎসালয়টির নাম করণের জন্য ৺মহেশ ভট্টচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মিহিরবাবুর মামাতো ভাই (৺ভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়) এর ব্যবহৃত কিছু আলমারী, চেয়ার, টেবিল এই কাজের জন্য দান স্বরূপ পেয়ে মিহিরবাবু সাঁইথিয়ার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীরাম কুমার আঁচালিয়াকে দিয়ে ঐ সব আসবাব পত্র কলকাতা থেকে তাঁতি পাড়ায় আনানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের নিত্যকার কাজের জন্য একজন চিকিৎসক বিশেষ প্রয়োজন। তাই মিহিরবাবু প্রথমে তাঁর প্রিয় কর্মীদের মধ্যে গৌর, মণ্টুকে ও সুনীলকে হোমিওপ্যাথী শাস্ত্রের বই অধ্যয়ন করতে উৎসাহ দেন এবং রেজিষ্টার্ড হয়ে উঠার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিউড়ী থেকে প্রতি সপ্তাহে একদিন নিজব্যায়ে তাঁতিপাড়ায় এসে স্বেচ্ছাসেবা দিতে রাজী হলেন। সেইসাথে ডঃ গুরু প্রসাদ ঘোষাল মহাশয়ও অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবার জন্য সিউড়ী থেকে তাঁতিপাড়ায় আসার কাজে যোগদান করলেন। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক কাজের জন্য গোহালী-য়াড়া নিবাসী প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীসত্য প্রসন্ন দাস (রেজিষ্টার্ড, হোমিওপ্যাথ) স্বেচ্ছাসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে রাজী হলেন; এবং দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আর তাঁর সহকারী হিসাবে শ্রীসুনীল দাস ও কাজ চালাতে রাজী হলেন। পরবর্ত্তী কালে সুনীল দাশ ও রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথ হিসাবে গণ্য হন। এই চিকিৎসালয়ে পরবর্ত্তী কালে যাঁরা স্বেচ্ছাসেবা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তারা হলেন শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ, ডাঃ শ্যামল মুখার্জ্জী ডি. এম. এস. ডাঃ মলয় ভক্ত ডি. এম. এস। ২৭. ১, ৭৩ সালে শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়টি পরিদর্শন পূর্বক লিখেছেন

"তাঁতিপাড়া মহেশ ভট্টাচার্য্য দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর দাশ মহাশয়ের উদ্যম ও উৎসাহ অতীব প্রসংসনীয়। তাঁহাদের নিস্বার্থ কর্ম প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্থানীয় ডাক্তারও কর্মীবৃন্দ, এমন কি সিউড়ীর প্রবীন ডাক্তারগণ যেভাবে স্বার্থহীন আন্তরিক সেবাদান করিতেছেন তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই জন হিতকর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।"

এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে ·০ পয়সা টোকেন ফি দিয়া ঔষধ নেওয়ার নিয়মটিও মিহিরবাবুর মতানুসারে চালু করা হয়। চিকিৎসালয়টির খরচাদি বহনের জন্য সময় সময় তাঁতিপাড়া গ্রামে মুষ্টি ভিক্ষা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। সহৃদয় ডাঃ অরুণা ব্যানার্জ্জী ৺মহাদেব দাস, ৺যতীন সিংহ ৺ননী গোপাল লাহিড়ী মহাশয়দের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

১৯৬৯ সালের গোড়া থেকেই মিহিরবাবুর স্থানীয় কর্মীগণের সহিত পরামর্শ ক্রমে যাবতীয় চিন্তা ভাবনা করতেন। "আমার ইচ্ছা তোমাদের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হউক"—এই নীতিতে সব সময় চলতেন। এই সময় তাঁতিপাড়া গ্রামের 'জাহানা কুড়ি' ও 'বড় হিড়' নামক দু'টি পুকুরের সংস্কার কল্পে মনোযোগ দিয়ে প্রায় ১৫০/২০০ বিঘা জমির সেচব্যবস্থার সম্প্রসারনের একটি কাজে

উদ্যোক্তাদের প্রেরণা দেন। স্থানীয় কর্মীদের বিশেষ অনুরোধে তিনি ১৯৭৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী, একটি অরাজনৈতিক চাষী সংগঠন বীরভূম জেলার গড়ে তুলবার জন্যে মহাতীর্থ বক্রেশ্বর ধামে জেলার সমগ্র চাষী সমাজকে আহ্বান জানানোর ব্যবস্থা করেন। এই সভায় "বীরভূম জেলা চাষী সংঘ" গঠনের প্রাস্তাব গৃহীত হয়। ভূমিহীন সর্বত্যাগী চাষী দরদী মানুষ হিসেবে মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়কে চাষী সংঘের সভাপতি করা হয়। এবং সেই জেলার কৃষি পণ্ডিত শ্রী বৈদ্যনাথ দে মহাশয়কে সম্পাদক মনোনীত করা হয়। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গে একটি কৃষি-তদন্ত কমিশন গটনের দাবীও প্রস্তাব আকারে নেওয়া হয়। মিহিরবাবু মনে করতেন গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে ধান আছে। গ্রামে গ্রামে মজুর আছে। কাজেই গ্রামের ধান থেকে গ্রামেই চাল তৈরী করতে পারলে গ্রামের শ্রমিক শ্রেণীরাও কাজ পাবে, চাষীরাও লাভবান হবে। আর এই কাজের জন্য কোনও সরকারী অর্থের প্রয়োজন হয় না। তাই মিহিরবাবুর ইচ্ছানুসারে চাষী সংঘের সদস্যদের একটি প্রতিশ্রুতিপালনে স্বাক্ষর করতে হতো। প্রতিশ্রুতি হল—"আমি এই চাষী সংঘের মেম্বার হিসাবে গ্রামের ধান থেকে গ্রামেই চাউল তৈরী করে গ্রামের শ্রমিক শ্রেণীর কর্ম সংস্থান ও পল্লী সংগঠনের কাজে চাষী / চাষের শ্রমিক / চাষী হিতৈষী হিসাবে যথাসাধ্য আপন কর্ত্তব্য পালনের সঙ্কল্প নিয়েছি এবং মাসিক পাঁচ পয়সা চাঁদা দিয়া সংস্থার মেম্বার শ্রেণীভুক্ত হইতেছি।"

মিহিরবাবু মনে করতেন সাধারণ মানুষকে সংঘের প্রতি জড়াতে গেলে তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে তা সম্ভব নয়। তাই সংঘের প্রথম কাজ হিসাবে স্থির করলেন—পশ্চিলবাংলায় প্রচলিত জমির খাজনায় স্বাধীনতার আগে যেমন বৈষম্য ছিল; স্বাধীনতার এতকাল পরেও সেই বৈষম্য তো বজায় আছে। তদুপরি এই বৈষম্য সেচ-এলাকায় তিনগুণ এবং অসেচ এলাকায় দ্বিগুণ করে সরকার বাহাদুর বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছেন। তাই প্রথমেই স্থির করলেন যে এই বৈষম্যমূলক খাজনা পশ্চিমবাংলা থেকে রহিত হওয়া প্রয়োজন। এই যুক্তি সামনে রেখে চাষী সংঘের সংগঠনের কাজে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই জেলার কোন না কোন স্থানে চাষী সংঘের সভা ডাকতেন। আর ঐ সব সভায় যাওয়ার জন্য কয়েকজন অনুরাগী কর্মীকে নিয়ে যাতায়তের পথে বলতেন—ভাড়া কিন্তু সংঘের সদস্যফি থেকে নয়। আবার আরও বলতেন "আমাদের দলে যে বয়সে বড়, খরচা তারই" তাই তিনিই বেশীর ভাগ খরচা বহন করতেন। চাষী সংঘের সভার খরচ বহন করার জন্য তিনি বলতেন যে "যেসব চাষীরা সভায় আসবেন, প্রত্যেকেই এক কেজি চাল সঙ্গে আনবেন।" কাজেই যেখানেই সভা, সেখানেই খিঁচুড়ি—সারাদিন ধরে চলতো আলোচনা। বেশীর ভাগ সভার উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতেন—শ্রীশান্তিকুমার মুখোপাধ্যায় ( বর্তমানে, প্রধান শিক্ষক মাধাইপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যালয়। ) বয়স্ক কর্মী হিসাবে শ্রীদাম চন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈষম্যমূলক খাজনার প্রতিবাদে তিনি জেলার বিভিন্ন বিধান সভার সদস্যদের দিয়ে বিধান সভায় আলোচনার জন্য প্রশ্ন রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তদানীন্তন স্পেশাল সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,



ভূমি রাজস্ব, ভূমি সংস্কার শাখা,( পত্র নং ১১৩৯৯ ( ২ ), এল. রেড্ ৭পি ২০৫/০৪, তাং ২৮. ৬. ৭৪

সমীপে শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠান, পোঃ তাঁতিপাড়া ( বীরভূম )

মহাশয়,

মুখ্যমন্ত্রীর নিকট লিখিত আপনার ৬ই মে, ১৯৭৪ তারিখের পত্রের উত্তরে জানাইতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার খাজনার হারের বৈষম্য সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন। এই প্রকার বৈষম্য অতীতেরই উত্তরদায়। রাজস্বের এই ধরনের বিভিন্ন হার ভারতের সর্বত্র কমবেশী রহিয়াছে। দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ খাজনার হার একই প্রকার ছিল। অথচ, এই সময়ে কৃষিজাত পণ্যদ্রবের মূল্য বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং গ্রামাঞ্চলে জল নিষ্কাষণ, সেচ, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য বহু অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই কারণে গ্রামাঞ্চলের কৃষি জমির মালিকদের নিকট হইতে প্রাপ্য সরকারী আয় কিয়ৎ পরিমাণে বাড়ানো যায় কি-না, স্বভাবতঃই সেই প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই কিছুকাল যাবৎ এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। শুধু বৈষম্য দূরী করণই নয়, সরকারী আয় বাড়ানোর প্রশ্নটিও এই সঙ্গে জড়িত। ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত "রাজ-কমিটি" বিষয়টি সকল দিক বিবেচনা করিয়া খাজনা প্রথা লোপ করে কৃষি আয়কর চালু করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুদিন আগে একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। এই কমিশন ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাবলীর সাথে উপরোক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

কমিশনের সাম্ভব্য সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র রায়তদের খাজনা দেওয়ার দায় হইতে রেহাই দিয়াছেন এবং অপেক্ষাকৃত বড় রায়তদের খেত্রে খাজনা হার বাড়াইয়াছেন। প্রস্তাবিত ভূমি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পর খাজনার হারে সামঞ্জস্য বিধান করার ব্যাপারে ব্যবস্থা লওয়া হইবে। এবং যতদিন তাহা না করা হইতেছে, ততদিন খাজনার বর্তমান হারই চালু রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ইতি—

নিবেদক

২৮. ৬. ৭৪. স্বাঃ শ্রীজিতেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

স্পেশ্যাল সেক্রেটারী

অবশেষে চাষী সংঘের সভাপতি হিসাবে মিহিরবাবু বিচারের জন্য ২৩. ৯. ৭৪ তারিখে কলিকাতা হাইকোর্ট জেলার চাষীদের কল্যাণে চাষী সংঘের পক্ষে হতে একটি মামলা রজু করেন। "পরিবারের সংজ্ঞা" "খাজনা-আদায়ের প্রচলিত রীতি" জলসেচের সুযোগ হতে বঞ্চিত অথচ সেচ-এলাকাভুক্ত বলে গণ্য জমির খাজনা মুকুব বর্গাদার ( ৭৫% ) মালিকের ( ২৫% ) উৎপন্ন ফসলের হারের অবিচার এবং

সেজন্য মালিকের নিকট হতে কেবল খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে বিচার 'প্রার্থনা' খাজনার—হারের অযৌক্তিক বৃদ্ধি-ইত্যাদি সামঞ্জস্য বিচারের জন্য এই মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইনটি নবম 'সি' তপশীলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্ট ভূমি সংস্কার আইনের মূলনীতি বিচারের ক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথ তাই শেষ অবধি হাইকোর্ট রায় দিলেন—বীরভূম জেলার সমস্ত রায়তদের প্রত্যেকটি জমির প্রকৃতি (সেচ/অসেচ) নির্দ্ধারণ না করা পর্য্যন্ত রায়তগণ পুরাতন হারে খাজনা জমা দিতে পারবেন। ১৯৭৪ সালে মামলা সুরু হওয়ার পর পরই বর্দ্ধিতহারে খাজনা আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় পুরাতন হারে খাজনা জমা দিবার সুযোগ গ্রহণের নিমিত্ত এই জেলায় চাষী সংঘের বাইশ হাজার সদস্য হয়।

চাষী সংঘের প্রতি চাষী সমাজের আস্থা ও আনুগত্য যাচাই করার মাধ্যমে তিনি এই সংগঠনের ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিচার করতে চাইলেন। তিনি মনে করতেন ভোট হচ্ছে—গোপন ব্যাপার। এই গোপন সমর্থনের দ্বারা চাষী সংঘের প্রতি মানুষের আনুগত্য যাচাই করা যেতে পারে। সুতরাং চাষীদের পক্ষে থেকে লোকসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশ্যে নিজে বোলপুর কেন্দ্রে লোকসভার প্রার্থীরূপে ১৯৭৭ এর নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। তিনি মনে করতেন যে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যেমন একাধিক প্রশ্ন থাকে; তন্মধ্যে পরীক্ষার্থী নিজের মনোমত প্রশ্ন বেছে নিয়ে উত্তর দেয়, চাষীরাও তেমনি নিজেদের পছন্দমত প্রার্থী নির্বাচনের মনোভাব চাষী সংঘের স্বপক্ষে প্রদর্শন করে কি-না তার যাচাই তো করা যাবে। তাই লোকসভার প্রার্থী হলেও প্রচার ও ভোটের আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তার সামান্যতম অর্থও তখন চাষী সংঘের সামর্থ্যের পক্ষে না থাকা সত্ত্বেও প্রার্থী হতে সংকোচ বোধ করেন নি। বিধান সভা নির্বাচনেও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর হাজি মোতালিব আলিকে এবং জেলা পরিষদের ভোটে শ্রীকালীপদ দাশকে প্রার্থীরূপে মনোনয়ন পত্র দাখিলের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বীরভূমের চাষীরা ঐ সব প্রার্থীদের কাকেও জয়লাভ সাহায্য করতে পারেন নাই। চাষীদের কল্যাণে যে সংগঠন কাজ করতে চায়, সেই সংঘের প্রতি সমর্থন লাভের পরীক্ষায় পাশ না করায় চাষী সংঘের কাজকর্মে ভাঁটা পড়ে। উদ্যোক্তাগণ সহ মিহিরবাবু তখন সমাজ সেবার দিকে মনোযোগ দিতে সুরু করেন। তবে একথা সত্য যে পরবর্তীকালে পশ্চিম-বাংলার প্রচলিত খাজনা আদায়ের পদ্ধতি লোপ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের তসর শিল্পের কাঁচামাল 'তসরগুটি' তাঁতিপাড়ার তাঁতশিল্পের জন্য বিভিন্ন রাজ্য—বিহার, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ হতে আমদানী হয়। কেবলমাত্র একক তাঁতিপাড়া গ্রামেই বছরে বছরে তখনকার দিনে ২৫/৩০ লক্ষ্য টাকার তসরগুটি বিহার ও উড়িষ্যা হতে আসত। অর্থাৎ কাঁচামাল "তসর-গুটির জন্য অন্য রাজ্যের মুখাপেক্ষিতা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কলঙ্কজনক এবং অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পের কাঁচামালের অভাবে শিল্পীরা সমস্যার মধ্যে পড়বেন—এই যুক্তিতে পশ্চিমবাংলায় তসরগুটি চাষের প্রবর্তনের দিকে মিহিরবাবু মনোযোগ দিলেন—১৯৭৭ সালে। তদানীন্তন ডি. এফ, ও, মিঃ থাপলিয়াল



এবং এ, ডি, এম শ্রীনরেশ চতুর্বেদী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি একটি তসর চাষের পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। উভয় অভিসারের মৌখিক অনুমতিক্রমে মহঃম্মদবাজার থানার শাল-জঙ্গলে "তসরগুটি" চাষের পরীক্ষা সুরু হয়। অভিজ্ঞ সাঁওতাল সেবিকালচার বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীকে দিয়ে এই পরীক্ষার কাজ সুরু হয়। বিহারের খোলা বাজার থেকে তসরগুটির বীজ কিনে আনিয়ে সূর্য্য হেমব্রমকে দেওয়া হয়—বীজ তৈরীর জন্য। মিহিরবাবু প্রতিদিন তাঁতিপাড়া থেকে ২৫।২৬ মাইল দূরবর্তী শুকনার জঙ্গলে এই পরীক্ষা মূলক চাষের পরিদর্শনে যাবেনই; একদিন মিহিরবাবুর জ্বর প্রায় ১০৩।১০৪ ফাঃ, তবুও তিনি জঙ্গলে যাবেনই। তিনি বলতেন আমি যদি না যাই, তাহলে কর্মীদের কাজের উৎসাহ বজায় থাকবে না। এই পরীক্ষা মূলক তসর চাষ লাভজনক হওয়ায় সরকারের নিকট এই পরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরে তসরগুটি চাষের প্রবর্তনের জন্য নানাভাবে আবেদন নিবেদন জানাতে সুরু করলেন। প্রচার করতে সুরু করলেন যে এই তসরগুটি চাষের দ্বারা যেমন শিল্পীদের কাঁচামাল তসরগুটির উৎপাদন হবে, তেমনিই জঙ্গলের ধারে পাশে বসবাসকারী সাঁওতালদের উপার্জনের এক নতুন পথ সৃষ্টি হবে। কিন্তু হায়! সেরিকালচার ও বনবিভাগ উভয়েই যুক্তি দিতে সুরু করলো—এই চাষে শাল জঙ্গলের ক্ষতি হয়। কাজেই শালজঙ্গলে তসরগুটি চাষ করতে দেওয়া যাবে না। অবশেষে মিহিরবাবু ১৯৭৯ সালের ১৫ই জুলাই বন-আইন অমান্য করবার আবেদন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে এবং বনমন্ত্রীকে পত্র লিখলেন। মিহিরবাবুর যুক্তি—কেন শাল জঙ্গলে তসরগুটির চাষ করতে দেওয়া হবে না, তার গ্রহণ যোগ্য উত্তর না দিলে বন-আইন অমান্য করবেন আর উত্তর দিলে আইন অমান্য করবেন না। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উত্তর না আসায় মিহিরবাবু নির্দিষ্ট দিনে 'চন্দ্রপুর' শাল জঙ্গলে বন-আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। মজার কথা পুলিশের গাড়ী করে মিহিরবাবুকে নিয়ে যায়এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আবার পুলিশ গাড়ী করে মিহিরবাবুকে তাঁর আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে যায়। এবং এই আইন অমান্যের জন্য মামলা পুলিশ দপ্তর করেন নাই।

পরবর্তীকালে বনদপ্তরের তদানীন্তন বনমন্ত্রী পরিমল মিত্রের নিকট বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও সভাপতি একটি ডেপুটেশন দেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। জেলার ডি, এফ, ও শ্রী কল্যাণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীউদয়ন দাসগুপ্তের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর (তসর) ডাঃ মানস গোবিন্দ দাস এবং তসর বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্যামসুলহক (কেন্দ্রীয় সরকারের তসর-রিসার্চের প্যাটেলনগর অফিসের অফিসার) এই তসরগুটি চাষের প্রবর্তনের প্রতি মত প্রকাশ করেন। বনদপ্তরের মাধ্যমে চন্দ্রপুর "অর্জুন জঙ্গলে" ১৯৮২ সালে তসরগুটি চাষের এক অভুতপূর্ব সাফল্যের দৃষ্টান্ত সম্ভব হয়। তদানীন্তন বীট্ অফিসার শ্রী প্রতুল দত্ত মহাশয় এই কাজের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জনসেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তসরগুটি চাষ দেখাশোনার কাজে ও উৎসাহ প্রদানের কাজে মনোযোগ দেওয়া হয়। পরবর্ত্তীকালে সেরিকালচার বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পতিত ডাঙ্গা জমিতে

খাদ্য গাছ অর্জ্জুন ও আসন গাছের নিবিড় জঙ্গল সৃষ্টি করে তসরগুটি চাষের প্রবর্তন পশ্চিমবঙ্গে চালু করে। মিহিরবাবু ভাবতেন সূর্য্যমুখী চাষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে এবং খাদ্য উপাদানে ভরপুর সোয়াবীন চাষের প্রবর্তন করতে পারলে এই গরীব দেশে মানুষের কল্যাণ হতে পারে। তাই তিনি বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সূর্য্যমুখী চাষের এক প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই চাষ গ্রামাঞ্চলে চালু করবার জন্য মিহিরবাবু একবার দু'কুইন্টাল সোয়াবীন বীজ এনে তাঁতিপাড়ায় হাজির করলেন। এই বীজ চাষীদের নিজ নিজ খামার বাড়ীতে লাগানোর উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ রাখেন। তিনি বললেন যে, "দেখো, কেউ যেন বীজগুলি ভেজে খেয়ে না নেয়; কাজেই বীজ ফেরৎ দেওয়ার কথা লিখিয়ে সহি করিয়ে বীজ দিতে পারবে।" এই বলেই তাঁর সংকল্পের কথা প্রকাশ করলেন।

এক সময় তিনি এই এলাকার মানুষের মধ্যে লেবু চাষে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০০ টি লেবুর কলম চারা কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট ফার্ম থেকে নিজ ব্যয়ে নিজ দায়িত্বে নিয়ে এসে বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেন। মাহারানপুর থেকে একবার পিন খেজুরের বীজ নিয়ে এসে তাঁতিপাড়ায় চারা তৈরী করিয়ে উন্নতমানের খেজুর চাষের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছেন। একবার তাঁতিপাড়ার সমগ্র গ্রামের বিশেষ করে হরিজন পল্লীর টক্ কুলের গাছগুলিতে নারকেল কুলের গ্র্যাফ্‌টিং করিয়ে মানুষের মধ্যে কাজের উৎসাহ সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছেন।

১৯৮০ সালে একবার তাঁর এক বোন আপদে বিপদে ব্যবহারের জন্য এককালীন দু'হাজার টাকা মিহিরবাবুকে দেন। মিহিরবাবু সেই টাকা নিয়ে তাঁতিপাড়া পৌঁছতেই বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিকট প্রস্তাব রাখেন যে, এই টাকা দিয়ে উন্নতমানের 'শাক্ সবজির বীজ বিভিন্ন সীড ফার্ম থেকে আনিয়ে দেবেন; আর সেই সাথে কিছু উন্নতমানের পেঁপের বীজও আনিয়ে দেবেন। আর এই বীজ ব্লকের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি করে প্রত্যেকের বাড়ীতে কিচেন্ গার্ডেন তৈরী করে ছাত্রছাত্রীরা কর্মশিক্ষার যাতে পরিচয় দিতে পারে, সেই ভাবে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপর চাপিয়ে দেন। আর পেঁপের বীজ থেকে বনদপ্তর মাধ্যমে চারা তৈরী করিয়ে পরিবার পিছু ৫টি করে চারা বিতরনের ব্যবস্থাও তিনি করেন।

১৯৮০ সাল হতে "অন্ধজনে দেহ আলো" এই মহৎ কাজে দাতব্য চক্ষু অপারেশন ক্যাম্পের প্রবর্তন তাঁতিপাড়ার সামাজিক জীবনে এক নতুন দিক খুলে দিল। এই ক্যাম্পের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য স্বেচ্ছায় এক কেজি চাল দেওয়ার জন্য স্থানীয় এলাকার শিক্ষক গৃহস্থ সকলের কাছে আবেদন জানানোর পক্ষপাতী হয়ে উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন। ১৯৮২ সালে মুরাডির শ্রীশ্রী বিজয় কৃষ্ণ রিলিফ সোসাইটির মাধ্যমে বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে একটি দাতব্য চক্ষু অপারেশন ক্যাম্পের স্থান তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতন ভবন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও স্থানীয় যুবকেরা এই ক্যাম্পের স্বেচ্ছা সেবক। শ্রীশ্রী বিজয় কৃষ্ণ রিলিফ সোসাইটির পক্ষে ডাঃ এ, টি, এম, হোসেন মহাশয়



অপারেশন করবার জন্য তাঁতিপাড়া আসেন। ক্যাম্পে অপারেশন যোগ্য ৭১ জন রোগী ভর্তি হয়েছে। বেলা প্রায় ১টা তখন পর্য্যন্ত ৩২ টি রোগীর অপারেশন কাজ সম্পন্ন করবার পর ডাঃ হোসেন বললেন তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। এই আকস্মিক খবর শুনে মিহিরবাবু ক্যাম্পে গিয়ে ডাঃ হোসেনের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন "সব রোগীর অপারেশন শেষ করে ক'লকাতায় ফিরুন।" তখন ডিসেম্বর মাস। একজন সৌম্য দর্শন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মুসলমানের পায় ধরেছেন বলে ডাঃ হোসেন লজ্জায় উদ্বেগে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। শীতের মধ্যেও তাঁর গা বেয়ে ঘাম ঝরতে সুরু করলো। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পুনরায় অপারেশন কাজ শেষ করে ক'লকাতায় ফিরলেন। তখন থেকে ডাঃ হোসেন বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় দাতব্য চক্ষু অপারেশন ক্যাম্পে আপারেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতির কথা লিখে জানালেন। এই প্রসঙ্গে মিহিরবাবু বললেন "আমরা যখন অজয় আশ্রমের কর্মীরূপে কুমিল্লা ছেড়ে চলে আসি, তখন এক বৃদ্ধ মুসলমান আমার পায়ে ধরে কেঁদে ছিল; আমার সেই ঋণ আজ পরিশোধ হল।"

১৯৮৩ সালের দাতব্য চক্ষু অপারেশন ক্যাম্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আসবার সম্মতি নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে মিহিরবাবু যান। সেই সময় শ্রীবলাইকৃষ্ণ রায়, আরামবাগ হ্যাচারীর মালিকের সঙ্গে মিহিরবাবুর পরিচয় হয় এবং বলাইবাবু মিহিরবাবুকে আরামবাগ হ্যাচারীর কর্মক্ষেত্র প্রদর্শন করান। সেখানকার হ্যাচারী দেখে মুগ্ধ হয়ে মিহিরবাবু বলাইবাবুকে বলেন "আপনি বীরভূমে এরূপ একটি হ্যাচারী করে দেখাতে পারেন; নতুবা আমার হ্যাচারী দেখে লাভ কী? বলাইবাবু তাঁকে হ্যাচারী করার উপযুক্ত জায়গা দিতে পারবেন কি-না জানতে চান। সঙ্গে সঙ্গে মিহিরবাবু জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এই আলোচনার কথা লিখে জানান। জনসেবা প্রতিষ্ঠানের নিজ ব্যয় প্রাথমিকভাবে তিন একর জায়গা লীজ্ নিয়ে আরামবাগ হ্যাচারীকে ব্যবহার করতে দেয়। পরে আরামবাগ হ্যাচারীর ব্যাপক উদ্দেশ্যে এবং এই হ্যাচারীর মাধ্যমে বীরভূমের বহু বেকার ছেলের স্বয়ংনির্ভর কাজের প্রতিষ্ঠার দ্বারা উপার্জনের প্রত্যাশায় জেলা কপক্ষের্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জনসেবা প্রতিষ্ঠান ২৫ একর সরকারী পতিত ডাঙ্গা ব্যবহারের বিষয়ে সকল প্রকার সহযোগিতা করবার সুপারিশ মিহিরবাবুর কাছেই পেয়েছে।

১৯৮৩ মে আরামবাগ হ্যাচারী প্রতিষ্ঠার ঠিক পর পরই সংগৃহীত ২৫ একর ডাঙ্গায় সকলপ্রকার ফলের বৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে একটি নন্দনকানন সৃষ্টি করে বীরভূমের গৌরব বৃদ্ধি কথা বলতেন। প্রাথমিকভাবে উক্ত ডাঙ্গায় তিন হাজার তালের আঁটি জনসেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যানে পোঁতা হয়। তিনি স্বপ্ন দেখতেন—এই তিন হাজার তালগাছ একসময় যখন বড় হয়ে উঠবে, তখন ঐ সব গাছের রস থেকে তালগুড়ের এক বিরাট কারখানা গড়ে উঠবে এবং বহু শ্রমিকের রুজিরোজগারের পথ প্রশস্ত হবে।

গ্রাম্য দুঃস্থ মহিলাদের তাঁত শিল্প-প্রধান এই তাঁতিপাড়া গ্রামে রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে বিহারের গান্ধীগ্রাম থেকে দু'খানি প্যাডেল চরকা নিজব্যয়ে এনে, তা থেকে সূতা কাটিয়ে উপার্জনের



৬

এক রেকর্ড তৈরীর ব্যবস্থা করেন—তাঁর নিজ আস্তানায়। দেখা যায় চরকা থেকে রোজগারের মাত্রা দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের জন্য ৬।৭ টাকা; মনে মনে উৎসাহিত হলেন—এইভাবে যে গ্রামের বেকার মেয়েরা যদি দৈনিক এই পরিমাণ টাকা উপার্জনের নতুন পথের সন্ধান পায়, বেঁচে যাবে। তাই তিনি তদানীন্তন খাদি কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীশৈলেশ ব্যানার্জী মহাশয়কে এবং পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় খাদি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কর্মকর্তাদের নিয়ে তাঁতিপাড়ার এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করলেন—১৯৮২ তে। এরই ফলে তাঁতিপাড়া গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বহুগ্রামে কয়েক শত চরকার মাধ্যমে রুজি রোজগার করে দুঃস্থ মহিলারা সংসার প্রতিপালন করছে।

তসর শিল্পের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তসর গবেষণাগারে লব্ধ নতুন প্রযুক্তি বিদ্যাকে ল্যাবরেটরী থেকে ল্যাণ্ডে টেনে আনার জন্য কেন্দ্রীয় তসর-অনুসন্ধান কেন্দ্রের ( রাঁচি ) অধিকর্তার নিকট আবেদন জানিয়ে মিহির বাবু সফল হন। উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত একটি Tasar Recling and Spinning Centre চালু হয়—পশ্চিমবাংলার মধ্যে কেবল-মাত্র তাঁতিপাড়া গ্রামেই।

সদর মহকুমার টেলিফোন বিভাগের অফিসার শ্রীঅমল চ্যাটার্জী মহাশয় তাঁতিপাড়া গ্রামে একটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিহিরবাবুর কাছে এলে, তিনি জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মাধ্যমে এই এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে গেছেন।

একবার বক্রেশ্বর তীর্থে স্নানের জন্য ট্যাক্স-প্রথা চালু করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টুরিষ্ট বিভাগ যখন তড়িঘড়ি প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন বজ্রকঠোর মিহিরবাবু "ময়ূরাক্ষী" পত্রিকার মাধ্যমে প্রতি-বাদের আওয়াজ তুললেন। ফলে সরকার প্রস্তাবিত ঐ ট্যাক্সপ্রথা চালুকরার সম্ভাবনা সুরুতেই দূরীভূত হল।

মানবদরদী মিহিরবাবু শিশু ও মায়েদের কল্যাণে তাঁতিপাড়ায় জনসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি "পালিত সেবাকেন্দ্র" ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র পরিচালনার ব্যবস্থা করে যান, ডাঃ মলয় ভক্ত, শ্রীসতীশ পৈতন্ডী, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দাশ এই কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবা দিচ্ছেন। শিশু বন্ধু মিহিরলাল শিশুদের কল্যাণে "শিশুতীর্থ" গঠন করে শিশুদের মানসিক ও দৈহিক গঠনের কাজে একসময় ব্রতী হন। গ্রামীন মানুষের কল্যাণে এবং যুবমানসে শিক্ষার গতি সঞ্চারের জন্য বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে "তাঁতিপাড়া গ্রামীন গ্রন্থাগার" স্থাপনের নিমিত্ত জমি দানে উৎসাহ দিয়ে যান।

তাঁর কর্মোন্মাদনা ও অদৃশ্য জীবনীশক্তি ছিল বলেই কোন কাজকে তিনি অবাস্তব মনে করতেন না। মিহিরলালের জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কোথাও রান্নার জন্য রান্নাঘর বানিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেন নাই; জীবনে হাট বাজারও নিজ হাতে করেন নাই। তাঁর জীবনের শেষ দিকে স্নেহধন্যা লীলাময়ী দাসী নামে এক মহিলা নিজের বাড়ীতে রান্না করে তাঁকে দিয়ে আসতেন। সারাটা জীবনই এভাবে তাঁর খাওয়া জুটতো, যা মনে হয় সাধারণভাবে কোনও



মানুষের ভাগ্যে জোটে না। তাঁর জীবনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে স্বনামে বা বিনামে কোন সম্পত্তি রেখে যান নি।

মিহিরলালের জীবন ১৯০১ সালের অগ্রহায়ন সংক্রান্তিতে ইতুপূজার দিনে পৃথিবী বিকশিত হয়। তারপর দীর্ঘ ৮৫ বছর ঘটনাবহুল জীবনে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বীরভূমের মাটিতেই শেষ হয়। ১৯৮৬ সালের ২৮ শে ডিসেম্বার ভোর ৩টা ১৫ মিনিটে অগনিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও বীরভূম-বাসীকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করে তিনি বিদায় নিলেন এই পৃথিবী থেকে। ১৯৮৬ সালের ১৫ই নভেম্বার পড়ে গিয়ে ফিমার বোন ভেঙ্গে যায়, ফলে তিনি শয্যাশায়ী হন এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। চিকিৎসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারেন নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে তিনি যখন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, তখনও তিনি বীরভূম ছেড়ে উন্নত চিকিৎসার প্রত্যাশায় আত্মীয় স্বজনের স্নেহছায়ায় ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে তদানীন্তন মুখ্য সেবিকা রেণুকা গাঙ্গুলী, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি, এন, গুহঠাকুরতা ও শ্রীমতী ইন্দিরা গুহঠাকুরতা ডাঃ সি, আর, ব্যাণার্জী আরও অনেক অনুরাগী মানুষ চোখের জল ফেলেছেন, এমন কি মহাশ্মশান বক্রেশ্বর পর্যন্তও সহযাত্রী হয়েছেন। তাঁর মরদেহ যথাযোগ্য মর্য্যাদায় সিউড়ি সদর হাসপাতাল থেকে বেলা ১১টা নাগাদ জেলাশাসক দপ্তর চত্বরে শহীদ মিনারে আনা হয়। পরে সিউড়ি সহর পরিক্রমা করে তাঁর সাধনক্ষেত্র তাঁতিপাড়ায় আনা হয়, এবং সমগ্র গ্রাম পরিক্রমা করে, গোহালিয়াড়া গ্রাম হয়ে বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পরিবারের আপনজনের ইচ্ছানুসারে ও তাঁদের উপস্থিতিতে বক্রেশ্বর মহাতীর্থেই তাঁর পুণ্যদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। গান্ধীজির আদর্শপুষ্ট ঋষিকল্প ত্যাগী দেশপ্রাণ মিহিরলাল চলে গেলেন; কিন্তু রইল তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের এবং আগামী প্রজন্মদের উদ্বুদ্ধ করার মহৎ প্রেরণা যা মানবিক ও হৃর্দিক।

## ★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ★

স্বাধীনতা সংগ্রামী মিহিরলালের জীবনকাহিনী রচনা ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা তথ্যাদি সরবরাহ করে অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করা হল।

১। 'বাবুর' মুখ থেকে শোনা কাহিনী ও ময়ুরাক্ষী পত্রিকা।

২। সংঘ জীবনে মিহির দা—সঞ্জীবকান্তি গুহরাজা।

৩। শ্রীমতী উমাশশী সিংহ ( ৺যতীন্দ্রনাথ সিংহের পত্নী, বোলপুর )।

৪। ডাঃ কাশীনাথ সাহা, মহম্মদ বাজার, বীরভূম।

৫। আমি যেমন দেখেছি মিহিরলালকে—কালিদাস শীল।

৬। 'আমার মামু' ডঃ বুদ্ধদেব চৌধুরী, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭। দু'একটি কথা—সুব্রতা চৌধুরী, প্রাক্তন শিক্ষিকা, আর, টি, গার্লস স্কুল সিউড়ি।

৮। দেশ সেবার পথে ( ২য় খণ্ড )—লালবিহারী সিংহ ( গ্রন্থ থেকে ) এঁরা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

৯। শ্রীহারাধন দাস, শিক্ষক, তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতন।

১০। „ গৌরহরি দাস, ঐ

১১। „ বৃন্দাবন দাস, শিক্ষক, মাধাইপুর পল্লীমঙ্গল বিদ্যালয়।

১২। „ কালীপদ দাশ, সম্পাদক বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠান।

১৩। „ অনুপম দত্ত, শিক্ষক, দুবরাজপুর সারদা বিদ্যাপীঠ এঁরা সম্পাদনার সহযোগিতা করেছেন।

১৪। „ বলাইকৃষ্ণ রায়, পোঃ আরামবাগ, হুগলী।

১৫। উৎসাহ ও প্রেরণাদাতা—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ( প্রাক্তন সভাপতি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পঃ বঃ )

## —ঃ বীরভূম জনসেবা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কার্যকরী কমিটি ঃ

১। শ্রী গৌর কিশোর দাশ, সভাপতি।
২। „ শশাংক শেখর গুঁই, সহসভাপতি।
৩। „ কালীপদ দাশ, সম্পাদক।
৪। „ সদানন্দ দাস, কোষাধ্যক্ষ।
৫। „ বৃন্দাবন দাস, সহসম্পাদক।
৬। „ নিত্যগোপাল মঙ্গল, সদস্য।
৭। „ মলয় ভক্ত ঐ
৮। „ অমরেন্দ্রনাথ দাস, ঐ
৯। „ সুনীল কুমার দাশ, ঐ

[ পোঃ তাঁতিপাড়া, ৫।৬।৯০ ]

# প রি শি ষ্ট

৺মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাজকর্মের
কতিপয় চিঠিপত্র সংযোজিত হইল।

# আইন অমান্যের নোটিশ

**পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় সমীপেষু—**

মাননীয় মহাশয়,

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া পুলের রাস্তায় চলাচলের টোল-ট্যাক্স (সাইকেল ৬ নঃ পঃ, রিক্সা ১০ নঃ পঃ, গরুর গাড়ী ৩১ নঃ পঃ) প্রত্যাহার করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দীর্ঘদিনব্যাপী সকল আবেদন-নিবেদন ও যুক্তিবিতর্ক ব্যর্থ হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষীর ন্যায় সংকীর্ণ, অগভীর ও বালুকাময় নদীর উপর সরকারী রাস্তায় চলাচল করিবার জন্য টোল-ট্যাক্স আদায় করার নীতি সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক এবং অন্যায্য। ময়ুরাক্ষী অপেক্ষা বৃহৎ, গভীর ও সর্বদা প্রবাহমান বহু নদীর উপরস্থ পুল পারাপারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে কোন টোল-ট্যাক্স আদায় করেন না।

তিলপাড়া পুলের যে রাস্তাটুকুর জন্য টোল-ট্যাক্স আদায় করা হয়, সেই স্বল্প দৈর্ঘবিশিষ্ট রাস্তাটি বীরভূম জেলার সদর মহকুমার সহিত রামপুরহাট মহকুমার সংযোগের একমাত্র পথ এবং সদর মহকুমার অন্তর্ভূক্ত এক অংশের সহিত অন্য অংশের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা।

যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিনে তিলপাড়া পুলের এই টোল-ট্যাক্স যেমন বিসদৃশ, অযৌক্তিক ও অন্যায্য তেমনি উহা বর্ত্তমান কালে অসহ্য। এই ধরণের নদীর উপর এই প্রকার টোল-ট্যাক্স সমগ্র ভারতে এমনকি পশ্চিমবঙ্গে বিরল। ইহা সরকারের প্রত্যাহার করা উচিত।

সরকার এ বিষয়ে কোন তৎপরতা প্রদর্শন অথবা নির্দিষ্ট অভিপ্রায় জ্ঞাপন না করায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অন্যায্য টোল-ট্যাক্স সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পন্থায় অমান্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

আগামী ১৫ই মার্চ্চ, রবিবার সকাল ৯টার সময় আমি টোল-ট্যাক্স ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিচার ও অন্যায়ের প্রতিকারার্থে নীতিগতভাবে এবং সম্পূর্ণ জনস্বার্থে আমাকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে।

আমার এই উদ্দেশ্য ও কাজের যথার্থ বিচার হইবে মানুষের বিবেকের নিকট। প্রানহীন সরকারী আইন যুগে যুগে যে ভুল করিয়া থাকে, এই আরও হয়ত তাহার ব্যতিক্রম করিবে না—ইহা জানিয়াই আমি এই কাজে ব্রত হইলাম।

সিউড়ী ( বীরভূম ) — মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

**৯।৩।৬৪**

সিউড়ী ( বীরভূম
৮।১।৬৪

## মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলিকাতা-১

মান্যবরেষু,

বীরভূম জেলার সিউড়ী সহরের সন্নিকটে তিলপাড়া নামক স্থানে ময়ুরাক্ষী নদীর উপরস্থ সিমেন্টের রাজপথে চলাচল করিতে সাইকেলের জন্য ৬ নঃ পঃ, রিক্সার ১০ নঃ পঃ এবং গরুর গাড়ীর ৩১ নঃ পঃ টোল-ট্যাক্স আদায় করা হয় ।

এই জেলাতেই ময়ুরাক্ষী অপেক্ষা বৃহত্তর অজয় নদী উপর ইলামবাজারের নিকটস্থ সিমেন্টের পাকা রাস্তায় নদী পারাপারের জন্য উক্ত যানবাহনের কোন টোল-ট্যাক্স নাই ।

শীর্ণকায়া ময়ুরাক্ষী ও অজয় নদী অপেক্ষা খরস্রোতা এবং গভীর অনেক নদীর উপর রাজপথে চলাচলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বহু জেলায় কোন টোল-ট্যাক্স নাই ।

বীরভূম জেলার তিলপাড়া গ্রামের নিকট ময়ুরাক্ষী নদী পারাপারের সরকারী রাজপথে সাইকেল, রিক্সা ও গরুর গাড়ীর জন্য বৈষম্যমূলক উক্ত টোল-ট্যাক্স আপনি উঠাইয়া দিলে সরকারী বে-সরকারী সর্ব্বশ্রেণীর জনগণ চির বাধিত বোধ করিবে ।

যথোচিত বিবেচনাপূর্ব্বক আগামী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হইতে উহা উঠাইয়া দিবার জন্য সবিনয় প্রার্থনা জানাইতেছি ।

বিনীত নিবেদক,
**মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়**

---

টোল-ট্যাক্স-পীড়িত জনগণ যৌথ অথচ এককভাবে অবিলম্বে অনুরূপ আবেদন ডাক-যোগে মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকানায় প্রেরণ করুন ।

# পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সমীপে—

## বিষয় ঃ বন-আইন অমান্যের ইচ্ছা

মাননীয় মহাশয়,

আপনি রাজ্যসরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, বীরভূম জেলার কেবলমাত্র তাঁতিপাড়া গ্রামটিতে বৎসরে কমপক্ষে পঁচিশ লক্ষ টাকার তসরগুটি স্থানীয় তসরবস্ত্র শিল্পের জন্য বিহার, উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ হইতে আমদানি হয়। সংলগ্ন গ্রামগুলির শত শত মহিলা আপন আপন ঘরে বসিয়া ঐ গুটি হইতে সূতা কাটে এবং তিন শতাধিক তন্তুবায় বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ছয় শত সহকর্ম্মীর সহযোগিতায় সেই সূতার তসরবস্ত্র উৎপাদন করে। উক্ত মূল্যের তসর গুটির একটিও বীরভূম জেলার কোন শাল জঙ্গলে উৎপন্ন হয় না—পশ্চিমবঙ্গ সরকার উৎপাদন করিতে দেন না। তাঁতিপাড়ার মতই কম বেশী পরিমাণ তসরবস্ত্র উৎপাদন বহু গ্রাম বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলাতে আছে। সেখানকার তসরবস্ত্র শিল্পীরা এবং তসর সূতা কাটুনিরা তাহাদের প্রয়োজনীয় তসর গুটির জন্য তাঁতিপাড়ার মতই ঐ সকল রাজ্যের মুখাপেক্ষী। পশ্চিমবঙ্গের এই চিরন্তন পরমুখাপেক্ষী অবসানের জন্য, কোনই উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ইংরাজ আমলে, কংগ্রেস আমলে, এমন কি বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও এ পর্য্যন্ত হইল না। এই রাজ্যের সরকারী সেরিকালচার, বন ও ট্রাইবাল বিভাগগুলির এই বিষয়ে গৌরবের কোন পুঁজি নাই।

তসরগুটি উৎপন্ন হয় সম্পূর্ণরূপে জংগলে, বাড়ীতে আদৌ নয়। জঙ্গলে তসর গুটিপোকা প্রতিপালনের সময়কাল প্রায় দেড় মাস। তখন তাহারা গাছের পাতা নিজেরা সন্ধান করিয়া খায়। প্রতিপালকরা দিবারাত্র তন্দ্রাহীন পাহারা দিয়া পোকাগুলিকে পাখী, গিরগিটি, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষণা-বেক্ষণ করে।

বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্ররাজ্যে জংগলবাসী উপজাতি ও পশ্চাৎপদ অধিবাসীগণ, সরকারের ও ব্যাঙ্কের উদার আর্থিক এবং কারিগরি পৃষ্ঠপোষকতায়, ধান রোপন এবং ধান কাটার অন্তর্বর্ত্তী অবসরকালীন বেকার মরসুমে, ব্যাপকভাবে এই চাষের দ্বারা কোটি কোটি টাকার তসরগুটি উৎপাদন করে এবং বৎসরে প্রায় দেড় দুই কোটি টাকার তসরগুটি সেখান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আমদানি হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত Indian Tasar নামক পুস্তিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"Experience has proved that cocoons raised on sal trees are

the best". অর্থাৎ শালগাছে উৎপন্ন তসরগুটি সর্ব্বোত্তম। বীরভূম প্রভৃতি জেলাগুলিতে ইতস্ততঃ প্রচুর শাল জংগল থাকা সত্ত্বেও, কেন ঐ সকল জগলে প্রয়োজনীয় সর্ত্তসাপেক্ষে তসরগুটি চাষ করিতে দেওয়া হইবে না—সেই যুক্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার শত অনুরোধ সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত কোনদিন ঘোষণা করেন নাই। বিধান সভার সদস্য শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র ( জনতা ), শ্রীসুনীতি চট্টরাজ ( কংগ্রেস ), শ্রীধীরেন সেন ( সি. পি. এম ) মাধ্যমে বিধান সভায় প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। এই জেলাবাসী মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডলের আনুকুল্যও ব্যর্থ হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, আদিবাসী মন্ত্রী, বনমন্ত্রী ও বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃস্থানীয়দের নিকট আবেদনও নিরর্থক হইয়াছে। অনুমতি না দেওয়ার কারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

কেহ যদি শাল জংগল বিনষ্ট হওয়ার যুক্তি দেন—বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্ররাজ্য তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত। কেহ যদি শালগাছের পাতা নষ্ট হওয়ার অজুহাত দেন, তিনি ভ্রান্ত। কারণ মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা শালপাতা জঙ্গল হইতে তুলিয়া এই পশ্চিমবঙ্গেই সর্ব্বত্র বিক্রয় হয়, কোন বাধা নাই। সব শাল জঙ্গল বৎসরান্তে প্রাকৃতিক নিয়মে পত্রশূন্য হয়, আবার নূতন পাতা গজায়। তসর-গুটিপোকা চাষে জঙ্গলের কোন ক্ষতি নাই, উপরন্তু পোকার মল পুষ্টিকর সার হিসাবে জঙ্গলের শ্রীবৃদ্ধি করে।

১১৭৭ সালের হেমন্তকালে বীরভূমের তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীযুক্ত এন. চতুর্ব্বেদী আই. এ. এস, উপজাতি প্রশাসক শ্রীযুক্ত পি কে নিয়োগী, বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত থাপলিয়াল মহোদয়গণের সৌজন্যে ও তত্ত্বাবধানে, এই জেলার মহম্মদবাজার থানার শুকনার শাল জংগলে সম্পূর্ণ বেসরকারী অর্থে ও ব্যবস্থায়, তসরগুটি চাষের এক স্বেচ্ছাসেবামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। দশজন সাঁওতাল শিক্ষার্থীকে দৈনিক পারিশ্রমিক দিয়া একজন আদিবাসী শিক্ষক দ্বারা তসরগুটি চাষ শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত অফিসারগণ ঐ কাজের সাক্ষী। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও জেলার কোন জঙ্গলে কোথাও তসরগুটি চাষের অনুমতি দিতেছেন না; না দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণও কাহাকেও জানাইতেছেন না। আদিবাসীদের আর্থিক উন্নয়নে এবং তসরবস্ত্রশিল্পী ও তসরসূতাকাটুনিদের হিতার্থে এই বহুমুখী সম্ভাব্যতা, সরকার প্রতিহত করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সস্তা ও সহজলভ্য হইতেছে না।

এই অবস্থায় বন-আইন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অমান্য করিয়া বীরভূমের শালজংগলে তসরগুটি চাষে উদ্যোগী হওয়া ব্যতীত সমস্যাটির অন্য কোন সুরাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বহু বৎসর যাবৎ আমি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নই এবং কোন রাজনৈতিক দলের সহিত আমার বিন্দুমাত্র সংশ্রব নাই। আদিবাসীদের আর্থিক কল্যাণে এবং তসর বস্ত্রশিল্পী ও কাটুনিদের হিতার্থে সরকার যদি বীরভূমের শালজংগলে, প্রয়োজনীয় সর্ত্তে, তসরগুটি চাষের অনুমতি দেন, অথবা কেন অনুমতি দেওয়া হইবে না জানান—তাহা হইলে আমি বন-আইন অমান্যে ব্রতী হইব না।



নতুবা, আমি আগমী ১৫ই জুলাই, রবিবার বেলা ৯টার সময় রাজনগর থানার চন্দ্রপুর শাল জংগলে তসরগুটি চাষের জন্য প্রকাশ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া, প্রয়োজনীয় গছগুলির প্রাথমিক পরিচর্য্যার, ফুলগাছ পরিচর্য্যার মত, ব্রতী হইব। সরকারের জংগলরক্ষকগণ এবং অফিসারগণ দেখিতে পাইবেন, আমি কোন শালগাছের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করিতেছি কিনা।

আপনাকে এই অগ্রিম সংবাদ দিয়া ঐদিন সরকারী বনআইনের বিথিনিষেধ অমান্য করার জন্য বিচারালয় আমাকে যে দণ্ড দিবেন—আমি নম্রভাবে তাহা গ্রহণ করিব।

বিনীত নিবেদক
**মিহির লাল চট্টোপাধ্যায়**
ভূতপূর্ব্ব সদস্য গণপরিষদ, লোকসভা ও বিধানসভা

পোঃ তাঁতিপাড়া ( বীরভূম )
১. ৭. ৭৯

সিউড়ী ( বীরভূম )
২-৩-৬৪

প্রিয় প্রফুল্লবাবু,

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট একটি আবেদনে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া পুলের রাস্তায় চলাচলের টোল-ট্যাক্স প্রত্যাহারের প্রর্থনা জানাইয়াছিলাম। কোন উত্তর পাই নাই। বিধান সভা ও বিধান পরিষদে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্ত্তমান অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বীরভূমের বহুলোক আবেদন নিবেদন জানাইয়া দরখাস্ত দিয়াছেন। জেলার কংগ্রেসী বন্ধুরাও সরকারের নিকট যথাযোগ্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। কোনও প্রতিকার হয় নাই। পূর্ত্তমন্ত্রী মাননীয় শ্রী খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় ১৯৫৭-৫৮ সালে আমাকে এই বিষয়ে যে দুইখানি পত্র দিয়াছিলেন, তাহার নকল এই সাথে আপনাকে দিলাম।

ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া পুলের উপরস্থ রাজপথটি বীরভূম জেলার সদর মহকুমার সহিত রামপুরহাট মহকুমার যোগাযোগের একমাত্র পথ। এমনকি, সদর মহকুমার মহম্মদবাজারথানা সমুদয় এলাকা এবং সাইথিয়া থানার কিয়দংশের সিউড়ী সহরের সহিত যোগাযোগের দ্বিতীয় কোন সরকারী রাস্তা নাই। সংকীর্ণ ও শুষ্ক ময়ূরাক্ষী নদীর উপর দিয়া চলাচলের এই একমাত্র সরকারী রাস্তায় সাইকেল, রিক্সা ও গরুরগাড়ীর জন্য যথাক্রমে ৬ নঃ পঃ, ১০ নঃ পঃ এবং ৩১ নঃ পঃ টোল-ট্যাক্স দিতে হয়। ছাত্রগণকে স্কুলকলেজে আসিতে, রোগীদিগকে হাসপাতালে আসিতে, চাষীজনসাধারণকে হাটবাজার আসিতে, আদালত, রেলস্টেশন পৌঁছিতে এই টোল-ট্যাক্স বহন করিতে হয়। ময়ূরাক্ষীর ন্যায় সঙ্কীর্ণ ও শুষ্ক নদী পারাপারের জন্য এই ধরণের টোল-ট্যাক্স পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে বিরল। যে নদী কোন ঋতুতেই খেয়া-নৌকা ব্যতীত কোনদিন পারাপার করা যায় না, তেমন অনেক নদীর উপর সরকার যাতায়াতের সুবিধার জন্য নূতন নূতন পুল নির্ম্মান করিয়াছেন, কিন্তু সরকার কোন টোল-ট্যাক্স ধার্য্য করেন না—ইহা সরকার অবিদিত নাই। দেশে চলাচল ব্যবস্থার বর্ত্তমান উন্নতি ও অগ্রগতির দিনে এই বৈষম্যমূলক টোল-ট্যাক্স অসমর্থনীয়।

তিলপাড়া পুলের এই টোল-ট্যাক্স উঠাইয়া সর্তের জন্য সরকারের নিকট সকল আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হওয়ায়, নিরুপায় হইয়া অহিংস-প্রতিরোধ ও দুঃখবরণ ব্যতীত অন্যপথ নাই বলিয়া মনে হইতেছে উৎপীড়নের প্রতিকার কল্পে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করিতে আপনি একদিন প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা সেই পথে আপনার সহযাত্রী ছিলাম।

কোন রাজনৈতিক কু-মতলব সিদ্ধি কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি আমার আচরণে আপনি কোনদিন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেন নাই। আজও আমার মনে তেমন কোন দুর্বুদ্ধি জাগে নাই। অন্যায়, অযৌক্তিক বৈষম্যমূলক সরকারী ব্যবস্থার প্রতিকারার্থে যদি আমি শান্তিপূর্ণভাবে সরকারী আইন অমান্যের পথে অগ্রসর নই—আশাকরি আপনার ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণ লইব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অপনিও আপনার ন্যায় ঐতিহ্যবিশিষ্ট পুরাতন সহকর্মীগণ আমার সেই আচরণ কখনই দোষনীয় মনে করিবেন না। আমি জানি, আইন-অমান্য ও সত্যাগ্রহ প্রভৃতি আপনার প্রদর্শিত মহান পন্থার অপপ্রয়োগ আজকাল বহুক্ষেত্রে ঘটিতেছে। টোল-ট্যাক্স উঠাইবার প্রচেষ্টা সে পর্যায়ভুক্ত নয়। আপনাদের অনুসৃত পন্থায় যদি বাধ্য হইয়া আইন-অমান্য ও দুঃখবরণ করিতে প্রবৃত্ত হই—আপনার নৈতিক সহৃদয়তা পাইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিব।

আপনাদের
মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

পুনঃ—মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রীর দুইখানি পত্র সংলগ্ন হইল।

To,
Shri Prafulla Chandra Sen
Mautri Nibas
Raj Bhawan,
Calcutta-1



# ॥ পয়লা বৈশাখ থেকে মদের দোকান বন্ধ ॥

ভাই সাঁওতাল ও অন্যান্য চাষীগণ,

আপনারা ও আপনাদের ঘরের মা-বোনেরা শুনে সুখী হবেন—এই চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ( ১লা এপ্রিল, ১৯৭৬ ) থেকে আপনাদের পাশাপাশি বিহার রাজে, আদিবাসী এলাকায়, পচুই মদের দোকানে আদিবাসীদের কাছে মদ বিক্রী বন্ধ হয়ে যাবে। আদিবাসীরা নিজের বাড়ীতে নিজের খাওয়ার জন্য মদ তৈরী করতে পারবে—অন্যকে বিক্রী করতে পারবে না। বিহারের আদিবাসীরা সরকারকে এই কাজের জন্য দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে। শুঁড়িকে আর মদের পয়সা দিতে হবে না। সেই পয়সা এখন থেকে মা, বৌ, ছেলেমেয়েদের পেটে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ভারতে আদিবাসীদের এলাকায় পচুই মদের দোকান খুলে মদ বিক্রীর ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে সুরু হয়। তার ফলে, এতকাল ধরে আদিবাসী সমাজের জমিজমার এবং আর্থিক সর্বনাশ হয়েছে। তাদের এলকায় মদ বিক্রীর দোকান বন্ধ করতে হবে; তারা ঘরে মদ তৈরী করে নিজে খেতে পারবে। বিহার গভর্ণমেন্ট হবে প্রথম পথ-প্রদর্শক ( ১লা এপ্রিল থেকে )।

বীরভূম জেলা চাষী সংঘের আদেশ—ভাই সাঁওতাল ও আদিবাসি চাষীগন ! আপনারা আপনাদের বিহার এলাকার আত্মীয়-স্বজনের মত, আগামী নূতন বছরের ১লা বৈশাখ থেকে আপন আপন এলাকার পচুই মদের দোকানে যাওয়া বন্ধ করুন। তাদের ঘরের মা-বৌয়ের মত আপনাদের ঘরের মা-বৌ সুখী হোক্।

ইংরেজ আমলে বীরভুম জেলার রাজনগর থানা, দুবরাজপুর থানা, মহম্মদবাজার থানা ও সিউড়ী থানার বহুগ্রামের আদিবাসী ও হরিজনরা আপন আপন সমাজের পঞ্চায়েতী সভা করে, স্বেচ্ছায় মদের দোকানে যাওয়া বন্ধ করেছিল। সমাজের মোড়ল-মুখিয়ারা দোকানে গেলে ১০·০০ দশ টাকা এবং অন্যরা ৫·০০ পাঁচ টাকা সমাজকে দণ্ড দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। তখনকার আবগারী কমিশনার ম্যাকফারসন সাহেব দোকানে দোকানে সন্ধান নিয়ে, বিনা পিকেটিংয়ে আপনাদের অঞ্চলে মদের দোকান বন্ধ করার কাজের প্রশংসা করেছিলেন। তখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিনোদবিহারী সরকার এবং জেলা জজ শ্রীব্রজকান্ত গুহ আদিবাসী ও হরিজনদের এই কাজের শুভ কামনা করতেন। পশ্চিম বাংলার লাট সাহেব শ্রীহরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা বইতে (why prohibition) আপনাদের

এই কীর্ত্তির কথা অমর করে রেখেছেন। তখন ইংরেজ রাজত্বের পুলিশ ছিল শুঁড়ি দোকানদারের চর—কত মিথ্যা ভয় আপনাদের দেখাতো।

আজ আপনাদের পক্ষে এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আজ আর কোন ভয় নেই। বীরভূমের কোন সাঁওতাল, আদিবাসী, হরিজন ১লা বৈশাখ থেকে পচুই মদের দোকানে যাবেন না—বীরভূম জেলা চাষী সংঘের আদেশ। সবাই সবাইকে এই কথা জানিয়ে দিন। এই কাগজ সকলকে পড়ান। জয়! মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়! ভারত মাতা কী জয়!

পোঃ—সিউড়ী ( বীরভূম )
৩১শে মার্চ, ১৯৭৬

মিহির লাল চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি, বীরভূম জেলা চাষী সংঘ



MINISTER IN THE
Ministry of Communications.

New Delhi;

The 13th March, 1956.

My dear Mihir Babu

Many thanks for your good wishes and kind sentiments you have expressed for me on my recent appointment as Minister.

I shall have enquiries made into the delay in delivery of newspapers etc., in Ranijung.

As regards provision of a telephone for public at Sealdah station, the matter is receiving my attention.

Yours sincerely,
(Raj Bahadur)

Shri Mihir Lal Chattopadhyay,
Suri (Birbhum) Bengal.

MINISTER
IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS.
New Delhi.

D. O. No. PHA. 14-116/56. Dated the 27th November, 1956.

My dear Mihir Babu,

This is in continuation of my letter of the 23rd October in reply to yours of the 20th October. I had asked the General Manager Telephones, Calcutta to look into the matter and a copy of the detailed report from him dated the 30th October, 1956, to the Chief Engineer of Posts and Telegraphs Department has also been endorsed to you.

As will be seen from the report, the service to your telephone was interrupted by a cable breakdown due to heavy rains and the same was set right by the telephone authorities.

As regards the Public Call Offices at Howrah, the position has been explained in the aforesaid note of the G. M. Telephones, Calcutta. He is taking action to replace the present attended P. C. Os by coin box P. C. Os and service will be available round-the-clock.

Yours sincerely,
(Raj Bahadur)

Shri M. L. Chattopadhyay,
33-B, Russa Road,
Calcutta.

MINISTER
WORKS AND BUILDINGS
WEST BENGAL

Calcutta,

D. O. No. M/WB/339. The 8th July, 1954.

My dear Mihir Babu,

I have received your letter of the 5th instant regarding toll on Mayurakshi Bridge on the Suri-Mohammadbazar Road in the district of Birbhum.

This is a matter to be dealt with by the Development (Roads) Department. I have, therefore, passed your letter, together with its enclosure, on to that Department for consideration.

Yours sincerely,
(K. N. DAS GUPTA)

Sri Mihir Lal Chattopadhyay,
P. O. Suri,
Dist. Birbhum.

Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi-110 001,

No. 8/5/72-FF. II. Dated the 1st September, 73.

To
Shri Mihir Lal Chatterjee,
Ex-Member, Constituent Assembly of India,
Acwree, Distt. Birbhum, (W. B.).

Sir,

I am directed to refer your letter dated 6. 6. 73 addressed to Prime Minister regarding the question of furnishing finger and thumb impressions by the freedom fighters at the time of receiving pension. It is not necessary for a person who can put his signature to furnish left hand thumb and fingers impressions, as part of the identification materials at the time of drawing pension. This is required in the case of a person who is not able to sign his name. This has also been incor-porated in the standard sanction letters for conveying sanction of pension from Central Revenues to the freedom fighters and their families (copy enclosed). All the A. Gs. and the State Governments have again been advised to ensure that freedom fighters are not put to inconve-niences.

Yours faithfully,
(R. L. PARDEEP)
Deputy Secretary to the Govt. of India.

West Bengal Secretariat,
Irrigation & Waterways Department,
Calcutta,
The 12th April, 1948.

My dear Mihir,

I am so very glad to know that Benodananda Babu has asked you to see Ram Charit Babu regarding the question of rehabilitation of the displaced men in Mor Project due to the construction of Mossanjore Dam. You know all about this project which you have been hugging in your heart for a pretty long time and in my opinion you are the best person to have a clear talk on the subject with Ram Charit Babu. You know people of this province are already on half starvation diet and there is no hope of producing any considerable quantity of food except with this dam. Moreover, the problem of a large number of influx from our eastern parts is a very tough one which we have to solve. This is a matter for Indian Union and every Nationalist, I am sure, will help us in our present deplorable situation.

More when we meet.

Yours sincerely,
Bhupati Majumdar

Sri Mihir Lal Chatterjee,
Member, Constituent Assembly.

West Bengal Secretariat,
Irrigation & Waterways Department
Calcutta.
The 12th April, 1948.

My dear Mihir,

In continuation of our talks I request you to kindly draw up a programme of tour in the Santhal Parganas with a view to create favourable public opinion in respect of the Mor Project. Will you please forward to me a copy of this programme so that I may instruct my officers to extend all possible help to you ?

Yours sincerely,
Bhupati Majumdar

Sri Mihir Lal Chatterjee
Member, Constituent Assembly.

217 Imperial Hotel
New Delhi.
8 April 1948.

As there has been unnecessary misunderstanding about the Mosanjor Dam and the people who would benefit from irrigation facilities therefrom, I take this opportunity of appealing to the people of the Santhal Parganas and the people of the Districts in West Bengal adjoining them to think nationally and altruistically. Down Damodar Dam benefits are as important as those above and alongside of the main Dam. I ask my people to remember that more than half a million acres of land can be irrigated by the water of the river Morakshi and the beneficiaries would be the citizens of West Bengal, overwhelmingly Adibasi. In some quarters, the Morakshi Project has been suspected as being a thin end of the wedge of Bengali infiltration. This apprehension is ridiculous and unfounded. It is also unpatriotic and selfish. We have a duty to West Bengal also. I appeal to Adibasis to help others whenever and wherever they can. Do unto others as ye would they should do unto you. I would ask my Bihari friends also to behave more reasonably. There has been enough of provincialism in the past, but I expect Free India to make a better show of inter-provincialism.

Jaipal Singh
President,
ALL.INDIA ADIBASI MAHASABHA

Constitution House,
New Delhi
The 31st March

My dear Ram Charitra Babu,

This is to introduce to you Shri Mihirlal Chatterjee, Member of the constituent Assembly. He is an old and tried national worker to Bengal and represented Birbhum district in Bengal Assembly till he vacated the seat for Dr. Ghosh. He is keenly interested in more project, I have explained to him the decision reached at Delhi in the last conference by which Bengal Govt. had undertaken to carry on propaganda amongst the affected villages in Dumka Subdivision. Shri Mihirlal Chatterjee wants to visit Dumka as a nominee of Bengal Govt. While endorsing the proceedings of the conference to H. P. M. I had suggested issuing of instructions to the Deputy Commissioner Santal Parganas to give effect to the decision of the conference. I hope that the instructions have been issued by Secretary to Govt. in the Irrigation Deptt., who may also pass this letter unto the Dy. Commr. for necessary action if you so approve. Of course, Shri Chatterjee will hand over an authority from Bengal Govt. to the Dy. Commr. Due to pressure of work at Patna I could not call on you for paying my respects to you. Hope you are quite well.

Yours Sincerely,
Binadananda Jha

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
সেচন ও জলপথ বিভাগ,
কলিকাতা।
১।৩।৪৯

প্রীতি ভাজনেষু,

মিহির, তোমার ২৮।২ তারিখের চিঠি আজ পেলাম। তুমি পত্রপাঠ এখানে এলে পরে একসঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করা যাবে। আমি মাঝে সিউড়ী গিয়েছিলাম এবং সেখানে একটা অভ্যর্থনা সমিতির সূচনা করে এসেছি। সমিতি তোমাকে সভাপতি করেছে শুনে খুশি হলাম। অন্য সব কথা তুমি এলে পরে হবে। বর্তমানে খুব ব্যস্তভাবে দিন কাটছে। শ্রী অনিল গাঙ্গুলী, আই, সি, একেকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর করেছি, বেচারী পরিশ্রমও করছিল কিন্তু হঠাৎ পান বসন্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে। খুব উৎসাহে দ্রুত কাজ চলছে। এবার ব্যারাজের মাত্র ভিত্তি স্থাপিত হবে। মশানজোর সম্বন্ধে বিহার কোন উচ্চবাচ্য করছে না। বিহারের প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিমন্ত্রন করেছেন কিন্তু আজও কোন উত্তর আনে নাই শুধু শ্রী বিনদানন্দ ঝাঁ মশানজোরে গ্যাডগিলজীকে অভ্যর্থনা করবেন জানিয়েছেন। চলে এসে কাজের ভার নাও, এই চাই।

ইতি
শুভাকাংখী

শ্রী মিহির লাল চট্টোপাধ্যায়।

## Progress of Work of "Mor Project"

Every possible effect is being made for irrigating 100,000 acres from the head-works from the kharif season of 1951 onwards. The foundation work of the Tilpara Barrage is complete and the piers and other super-structures have made fair progress. Orders for manufacture and erection of gates have been placed andthe barrage with the gates is scheduled to he completed by the 15th June 1951. It will also be possible to complete excavation of canals and construction of canal structeres for this area of 100,000 acres before the next monsoon. For thii work alone Rs. 80 lakhs are required the ·break-up ·being as follows :—

Work on Barrage······Rs. 17 lakhs ;
Gates······ Rs. 18 lakhs ;
Canal Excavation······Rs. 25 lakhs ;
Canal structures ····· Rs. 20 lakhs ;

2. This will leave only a sum of Rs. 20 lakhs, out of which Rs. 8 lakhs will have to be spent on establishment alone and the balance of Rs. 12 lakhs will barely meet the land acquisition charges for the restricted area. There will thes be no margin for work outside the restricted area of 100,000 acres.

3. If the time-table of the project is not to be seriously up-set and irrigation is to be progressively stepped up annually, it is essential to do the following works on the rest of the canal system and the dam.

(a) Excavation of main and branch canals······Rs. 12 lakhs ;
(b) Construction of structures, including 2 minor barrages at Kopai and Bakesar······ Rs. 10 lakhs ;
(c) Preliminary work at messanjore for the dam, including purchase of machinery, stock-piling of materials etc.······Rs. 15 lakhs ;
(d) Resettlement operations for displace people······Rs. 8 lakhs ;
(e) Land acquisition······Rs. 4 lakhs ;
(f) Establishment······Rs. 1 lakh ;

4. The above shows the minimum requirements and if these are not met work will suffer apprecially and the irrigable area cannot be increased in the next season. If another Rs. 50 lakhs can be made available preliminary works for Brahmani and Dwarka barrages will be started, land reclamation for resettlement of displaced persons will be done on a larger scale and machinery and stores will be collected for work on the dam the construction of which should start next year in right earnest.

( A. H. GANGULI )
Administrator, Mayurakshi Reservoir project & Ex. officio
Addl. Secretary, I. & W. Deptt.

West Bengal Secretariat.
Calcutta
The 4th December, 1950

My dear Mihir,

Your letter dated 29th November, 1950, just received on my return from Patna. I may send somebody who will be able to explain everything to the powers that be. You plead for provision for 4 crores for Mor Project next year and we will do what we can to knock at their door. President, Rajendra Babu will give us some Sunday in February when he will be coming to his home village to attend a marriage ceremony. All the Engineers will be present at the Engineers Conference upto middle of January, and many of them, specially the CWINC Engineers, who would like to be present at the Messanjore Foundation Lying Ceremony approached the President through his military Secretary. This is the reason why the date has been changed. Anyhow as soon as the date is fixed I will let you know.

I hope this finds you in good health and spirit.

Yours sincerely,
Bhupati Majumdar

Sri Mihir Lal Chatterjee, M. P.
27, Ferozshah Road, New Delhi.

Administrator, Mayurakshi
Reservoir Project and Ex-Officio
Additional secretary
Irrigation And Waterways Department
Writers, Buildings, Calcutta.
The 8th August, 1950.

D. O. No 378-AMP/S

My dear Sj. Chatterji,

Please refer to your letter dated the 2nd instant about increase of allotment for the Mayurakshi Project. I have shown your letter to H. M Irrigation and Waterways who appreciates your efforts and hopes that these will produce result.

2. The Project will help rehabilitation of refugees to some extent, as many of the refugees are employed on works in the Project. You are no doubt aware that a number of refugees are being settled in Birbhum and it is expected that a fair portion of them will find continued employment in canal excavation etc. for the next 3 or 4 years which will enable them to rehabilitate themselves. I trust this information will be useful to you.

Yours sincerely,
( A. B. GANGULI )

Sri Mihir Lal Chatterji, M. P.,
27, Firozsha Road, New Delhi.

D. C. No. 1408-C

Magistrate-Collector,
Birbhum
Suri, September 6, 1948.

My dear Mihir Babu,

Many thanks for your letter of the 2nd September. I am very glad to know that you have spoken about this matter to the Hon'ble Railway Minister and that my note has been of some use to you. I went to Asansol two days ago and had an informal talk about the Kasthagram Pariharpur Line with Mr. W. H. Gillon, Divisional Superintendent, E. I. Railway, Asansol. Mr. Gillon looked up the papers and told me that the line was in such a state that it is unlikely to be allowed to carry a passenger carriage with an engine, which would put a weight of about ninety tons on the line. He further said that it might be possible to provide for a Rail Bus Service with a light diesel engine fitted with a passenger coach and rail wheels, which would weigh only five or six tons. He told me that diesel engines are available and that the Body could be fitted without difficulty at the Railway Workshop. I understand that such Rail Buses are in operation on some other lines. A Rail Bus like that would carry 20/30 passengers and might do two trips each way daily. Perhaps this suggestion might be conveyed to proper authorities to forestall any technical objection.

I have noted your valuable suggestions regarding militia recruitment.

I met Dhanada Babu on the train yesterday and he told me that you are likely to visit Hardwar after the session is over. I had been there many years ago. It is a very nice place. I hope you are well.

Yours sincerely,
S. N. Maitra

Sri Mihirlal Chatterjee,
Member, Constituent Assembly
51, Constitution House
New Delhi

Administrator, Mayurakshi
Reservoir Project and Ex-Officio
Additional Secretary
Irrigation And Waterways Department
Suri, Birbhum
The 26th July 1950

No. 707AMP

My dear Sj. Chatterji,

I am enclosing a short note giving detailed information about our works programme for the current year. I hope it will be clear from the statement that we badly need an extra Rs. 50 lakhs and can usefully spend another Rs. 50 lakhs. I hope your efforts on our behalf will be successful.

Yours sincerely,
A. B. GANGULI

Encl : As stated

Sri Mihir Lal Chatterji,
Member, Parliament ( India ),
32, Firozsha Road,
NEW DELHI

Grand Hotel
Simla
15.6.51

মান্যবরেষু,

মাঝে দাদা যখন শিমলায় আসেন, তাঁহার কাছে জানিতে পারি যে আপনি আসার পূর্বের চিঠি যথামত পাইয়াছেন। আমরা সকলে আশা করিয়াছিলাম আপনিও এখানে আসিবেন এবং আপনার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিবে। ছেলে মেয়েরা আপনাকে শিমলা দেখাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আশা করি সে সুযোগ আবার কোনদিন ঘটিবে।

কান্তা-পরিহারপুর লাইনে যাত্রী বহন সম্পর্কে দিল্লী ও কলিকাতা হইতে আমার চিঠির যে উত্তর আসিয়াছে, তার অনুলিপি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। ই, আই, রেলওয়ের চিঠি থেকে দেখা যাইতেছে যে আপনার অনুমানই ঠিক, যাত্রী চলাচল হইলে আর্থিক লাভেরও সম্ভাবনা। সুতরাং এই কাজটি অনুমোদন করিতে রেলওয়ে বোর্ডের আর কোন দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। এখন আশা করা যাইতে পারে কাজটি শীঘ্রই অনুমোদিত হইবে।

আশাকরি আপনারা কুশলে আছেন। নমস্কার জানিবেন।

ইতি
বিনীত—
কেশবলাল গঙ্গোপাধ্যায়

Kailash Behari Mathur

E. I. Railway,
General Manager's
Office, Calcutta

D. O. No. CC/RH/452.

The 9th June, 1951

My dear Ganguly,

Re : Proposal for opening the Kasta-Pariharpur Branch for passenger traffic.

Ref : Your D. O. No Ins. 14-T (18)/51 dated 6th May, 1951.

On re-examination, the above proposal was found financially justified and has already been recommended to the Board.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd.

Sri K. L. Ganguly,
Chief Govt. Inspector of Rlys.,
Simla.

GOVERNMENT OF INDIA,
Ministry of Railways,
( Railway Board )
D. O. No. 1191-TT/Misc. Pt. (1).
New Delhi, dated the 30/31th May, 1951.

Subject : Proposal for opening the Kasta-Pariharpur Branch for Passenger traffic.

My dear Ganguly,

Please refer to your D. O. letter No. Ins. 14-T (18)/51 dated the 16th May, 1951.

2. The matter is already under active examination and it is hoped it will be finalised shortly.

Yours sincerely,
S/D-F. C. Badhwar

Shri K. L. Ganguly
Chief Govt. Inspector of Rlys.,
Ministry of Communications,
Simla.

NEW DELHI
April 28, '51.

Dear Mr. Chattopadhyay,

Will you please refer to your letter dated April 28, 1951.

The territorial jurisdiction of 'Viswa-Bharati' has been settled in consultation with the Government of West Bengal, and cannot be changed without reference to them. I am afraid that it is not possible to include the Municipality of Bolpur within the territorial jurisdiction.

I may, however, point out that the territorial jurisdiction only restricts the powers of the University to be conferred by or under this Act, to the specified area. This means that no Colleges or other institutions can be established or affiliated outside the territorial jurisdiction. There is, however, no bar to pupils from any part of India or outside coming and studying at the University.

Regarding clause 31 to which you refer, you will notice that it prescribes that every student of the Uuiversity shall reside in a Hall or Hostel or "under such conditions as may be prescribed by the Statutes and the ordinances". The University authorities will, therefore, have the right to admit pupils living even outside the territorial jurisdiction of the University provided they can satisfy the conditions of corporate life required in a residential University.

As pointed out by you, the first Statute would be framed by the Central Government, and we shall try to provide a clause in the Statute by which the University authorities may permit the admission of students from outside the territorial jurisdiction of the University subject to conditions ensuring their participation in the corporate life or the University.

Yours sincerely,
Sd/-Humayun Kabir.

Shri Mihir Lal Chattopadhyay, M. P.

**Note of dissent on the select Committee report on finance Bill**

I have my difference about raising the duty on Hooka and Chewing tobacoo by 75% from annas four to seven per pound. So much of increase cannot be justified by any means whatsoever, In 1943 a duty of only one anna per pound was imposed on this article and later on by two instalments it has been raised to four annas. Now again to propose further enhancement by as much as seventy four percent would not be just and fair to those on whom it would fall. It is well known that comparatively poorer classes of agriculturists and wage-earners enjoy this traditional style of smoking which is less expensive than Biri or Cigarette. They usually purchase the leaves and process them at home by mixing with other ingredients which make the tobacco fit for hooka. Hooka smoking from generations past is a necessary custom of social entertainment among working classes in rural areas. It is their recreation, relief, stimulation and joy at cheapest cost. Excessive duty on hooka tobacco will result in pushing the poorer section of smokers to change from hooka to Biri and cigarette which will considerably damage their present day economy. Biri tobacco which is meant for manufacturing purpose is proposed to be raised by 17% and I see no reason why hooka and chewing tobacco, very largely used for domestic consumption, should be penalised by an enhancement of 75% which is beyond all proportions. Even though the present financial position demands exploitation of new sources of revenue and taxing, chewing and hooka tobacco is considered to be unavoidable, this article fully deserves very much less enhancement than proposed. It will be cruel on the poorer section of smokers to subject them to taxation which will make their little joy of smoking almost prohibitive. I am emphatically of opinion that the duty on hooka and chewing tobacco should not be for the present, even a pie above six annas per pound.

Mihir Lal Chattopadhya

Directorate of Health Services
West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta
The 5th March, 1951

W. O. No. 939-P

Dear Sri Chatterjee,

I am glad to get your letter dated 19. 2. 51 along with the enclosures from Dr. Rup Narayan, Dental Surgeon of Delhi. The students of the City Dental College passed out after the year 1939 were not allowed to be registered under the Dental Council. The Govt. of India has asked for a list of dental practitioners who have passed out of the City Dental College up to March, 1940. The Dental Council of West Bengal is preparing the list for submission to the Govt. of India. The cases will receive all necessary consideration that is due.

Reference your scheme for Anti-Malarial work, it does not seem to have been received in this office. Please be good enough to send a fresh copy. I am sorry to have to put you to talk on this account.

Yours sincerely,
Benadananda Jha

Sri Mihirlal Chatterjee, MP
27, Feroze Shah Road, New Delhi

C. VENKATARAMAN
Director of Audit & Accounts

D. O. No. 1380-TAII/76-72 (ii)

Sub.: Production of identification documents for drawing pension by freedom fighters.

Dear Shri Chatterje,

Please refer to your letter dt. 6. 6. 73 addressed to the C. A. G. of India on the subject mentioned above. Instructions have been issued to the A. G. Central, Calcutta not to ask for the thumb and finger impression when a pensioner can sign his/her name. This is the position under the rules also.

Yours sincerely,
(C. Venkataraman)

Shri Mihir Lal Chatterjee,
Ex-Member,
Constituent Assembly of India,
Suri, (Birbhum),
WEST BENGAL,

MINISTER
WORKS AND BUILDINGS
WEST BENGAL
Calcutta.

D. O. No. M/WB/384. The 3rd July, 1958.

My dear Mihir Babu,

Please refer to your letter of the 27th ultimo regarding exemption of cycles and rickshaws from payment of Toll Tax on the Tilpara Barrage.

I am looking into the matter and shall let you know later on.

Yours sincerely,
(K. N. DAS GUPTA)

Sri Mihir Lal Chatterjee, M. L. A.,
Suri (Birbhum).

Government of West Bengal
AgricultureDepartment

From : Shri C. C. Bose,
Deputy Secretary.

To : Shri Mihir Lal Chatterjee, Suri, Birbhum.

No. 980-M&W dated, 31st January, 1964

Subject : Realisation of extra paddy by Rice Millers, Aratdars etc. in Birbhum district.

Sir,

I am directed to refer to Chief Minister's Secretariat letter No. 30002PS dated 22.11.63 and to say that the practi of realisation of 'Dhalta' by the Rice Millers in Birbhum district is reported to have been discontinued from 1.12.63.

2. I am to inform you fhrther that wih a view to effectively checking the malpractice ol extra realisation in the trade of agricultural produce in general, it is necessary to undertake suitable legislative measures and that a Bill in this regard has how been under consideration of Government.

Yours faithfully,
C. C. Bose
Deputy Secretary.

MINISTER
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
New Delhi,

D. O. No. 8/5/72-F. F. II

September 27, 1973

My dear Pranab,

I have received your letter No. 73/DM (ID)/P/1 dated 26th August, 1973, regarding the identification of freedom fighters. The difficulty pointed out by you had already come to our notice, and suitable instructions were issued to all Accountants-General. It has been clarified to them that it is not necessary for a freedom fighter who can append his signatures, to furnish left hand thumb and fingers' impression as part of the identification material at the time of drawing of pension. Such identification will, however, be necessary if the freedoom fighter is not literate.

I hope there will be no difficulty in future. If, however, you come across any specific case, you may kindly let us know.

With regards,

Yours sincerely,
( K. C. Pant )

Shri Pranab Mukherjee,
Deputy Minister of Industrial Development,
New Delhi.

MINISTER
Land Utilisation and Reforms and
Land and Land Revenue Department
Government Of West Bengal
Writers Buildings
Calcutta-1

No. 16879 PS/M/Rev.

December 14, 1976.

Dear Sir,

I am in receipt of your letter dated 15. 11 1976, addressed to the Chief Minister Government o West Bengal, regarding rationalisation of land revenue.

You are perhaps aware that the Committee on Texation of Agricultural wealth and Income appointed by the Government of India under the Chairmanship of Dr. N. K. Raj recommended, among other things, replacement of land revenue and surcharges thereon by Agricultural Holdings Tax. The tax will be levied on the value of the yield of the crop of a holding on a progressive scale. with the object of rationalising the land revenue structure Government are conducting feasibility studies about the introduction of Agricultural Holdings Tax in the State

Yours faithfully,
Gurupada Khan

Shri Mihir Lal Chatterjee
Birbhum Zilla Chasi Sangha
P. O. SURI
Dist, Birbhum

2C

P. O. Birbhum
West Bengal
May 3, 1979

Dear Shri Jagjivan Ramji,

It was so exciting to meet you again at the Art Exhibition at calcutta after an age so to say.

Now I seek your help in a mission for the welfare of the Tribals anb Scheduled Caste people of West Bengal. You ar universally regardec as a Custodian for their Welfare, economic development, employment and other matters since Transference of Power.

The Tribals and Scheduled Caste people of Behar (Santal Parganas), Orissa, Madhya Pradesh and Andhra, during their idle months rear TASAR COCOONS in the forests of those States and make handsome income.

But the Tribals and Scheduled Caste people of West Bengal, since independence are not allowed to do this work in the forest of this State even on similar terms and conditions as in the above mentioned States. This is strange, meaningless and horrible discrimination—which demands immediate removal so that those people may avail themselves of the earliest opportunity to do this work in their idle months between kharif cultivation and harvesting for their employment and economic welfare,

With all expectation th hear from you and with best wishes,

Yours Sincerely

( A colleague in the Constituent Assembly )

Shri Jagjiva Ram
Minster
New Delhi

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office Of The Director, Sch. castes & tribes welfare,
8, Lyons Range, Calcutta-2

To The District Magistrate
Birbhum

Subject :- Caltivation of Tassar Cocoons in the Sal Forests by the Adibasis of West Bengal.

The undersigned is directed to send to send herewith a copy of the letter dated 14,12,78 from Shri Mihir Lal Chattopadhyaya and a copy of the letter dated 2.2.79 from Shri Kalipada Das Secretary, Birbhum Janaseva pratisthan along with a copy of its enclosure which will speak for themselves.

He is requested to kindly send a detailed report along with his comments in the matter early.

for Director, Sch, castes
and tribes welfare.

No..... .../1(2) TWD, Dt..........'79

Copy forwarded for information to :

1. Shri Mihir Lal Chattopadhyaya, Vill. & P, O, Suri, Dist, Birbhum
2. Shri Kalipada Das, Secretary, Birbhum Janaseva Pratisthan, P.O, Tantipara Dist, Birbhum.

for Director, Sch, castes
and tribes welfare.

SR/16.2,

# শুদ্ধিপত্র

কথারম্ভ।

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | লাইন | পাতা |
|---|---|---|---|
| জনবসত্ত | জনবসতি | ১ম | ১ |
| মানুষটি | মানুষটির | ৪ | ১ |
| গ্রামগুলি | গ্রামগুলির | ৫ | ১ |
| টালমটাল | টালমাটাল | ১১ | ১ |
| সর্বোপরী | সর্বোপরি | ১৭ | ১ |
| ১ম পর্ব। | — | — | — |
| পিঠোপিঠি | পিটোপিটি | ১৫ | ৫ |
| ভাবি | ভাবী | ১০ | ৬ |
| আশির্বাদ | আশীর্বাদ | ১৪ | ৬ |
| টায় | ঠায় | ২৭ | ৭ |
| করালো | করলো | ৪ | ৮ |
| এক | আর এক | ১২ | ৮ |
| দাঁড়িয়ে | দাঁড়িয়ে | ১৩ | ৮ |
| হাঁও হাঁও | হাঁউ হাঁউ | ১৫ | ৮ |
| আমি | আম | ২৬ | ৮ |
| এগেয়ে | এগিয়ে | ১ | ৯ |
| করেছেন | করছেন | ২৯ | ৯ |
| ডিভিজনে | ডিভিসনে | ৬ | ১০ |
| যাবন | যাবেন | ৭ | ১০ |
| উদাও | উদাত্ত | ১২ | ১১ |
| ডিভিজন | ডিভিসন | ৭ | ১২ |
| দিয়ে | নিয়ে | ১৩ | ১২ |
| প্রশয় | প্রশ্রয় | ২৪ | ১৩ |
| রাজারাজরাদের | রাজরাজাদের | ১৩ | ১৩ |
| শ্রাবন্তী | শ্রাবন্তী | ১৪ | ১৩ |
| একবা | একবার | ৭ | ১৪ |
| ২য় পর্ব। | — | — | — |
| পড়লো | পড়লেন | ৯ | ১৫ |
| উদিয়মান | উদীয়মান | ১৬ | ১৫ |
| পরিশীলিত | পরিশীলিত | ২০ | ১৫ |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | লাইন | প. |
|---|---|---|---|
| সাধাণরক্ত | সাধনারক্তে | ২১ | ১৬ |
| স্বেচ্ছাদারিত্র- | স্বেচ্ছাদারিদ্র্য- | ৯ | ১৬ |
| বরণ | বর্ণ | | |
| রিপোর্ট | রিপোর্টে | ১ | ১৭ |
| অভিভিক্ত | অবিভক্ত | ১০ | ১৯ |
| বয়োকণিষ্ঠ | বয়ঃকনিষ্ঠ | ১৫ | ১৯ |
| স্নেহলিঙ্গন | স্নেহালিঙ্গন | ২২ | ১৯ |
| ঠিকাদার | টাঙ্কাকার | ৭ | ২০ |
| চেতসের | বেতসের | ৭ | ২০ |
| ৩য় পর্ব। | — | — | — |
| পিসিরা | পিসিমা | ১১ | ২১ |
| গিয়েছিল | গিয়েছিলেন | ১৩ | ২২ |
| জাগিয়াছিল | জাগিয়েছিল | ১৭ | ২২ |
| হয় | হন | ৭ | ২৩ |
| পড়ার | পরার | ৯ | ২৩ |
| মিহিরবাবু | মিহিরবাবুর | ১০ | ২৩ |
| ক্রিপস্ | ক্রিপস্ | ২৩। | ২৩ |
| করার | করায় | ৩ | ২৪ |
| সংযমী | সংযমী | ১৮ | ২৫ |
| ন্যায্য | ন্যায্য | ২৩ | ২৫ |
| কুট | কূট | ২৯ | ২৫ |
| স্বাচ্ছন্দের | স্বাচ্ছন্দ্যের | ৩ | ২৬ |
| সপূর্ণভাবে | সম্পূর্ণভাবে | ৮ | ২৭ |
| পার্থী | প্রার্থী | ১২ | ২৭ |
| হওয়ার | হওয়ায় | ১৩ | ২৮ |
| উর্দ্ধে | উর্ধ্বে | ১৫ | ২৮ |
| ঐকান্তিকত্তা | ঐকান্তিকতা | ২০ | ২৮ |
| উর্দ্ধতন | উর্ধ্বতন | ১১ | ২৯ |
| ভ্রান্ত | ভ্রান্তে | ১৩ | ২৯ |
| উৎগর্সীকৃত | উৎসর্গীকৃত | ১৩ | ২৯ |

কথান্তর :

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | লাইন | পাতা |
|---|---|---|---|
| প্রতিবিদামের | প্রতিবেদনের | ১৭ | ২৯ |
| উদ্দেশ্য | উদ্দেশ্যে | ২৫ | ২৯ |
| দেশসেবায় | দেশসেবার | ২৭ | ২৯ |
| অপৃশ্যতা | অস্পৃশ্যতা | ২৮ | ২৯ |
| গুরুগুলি | গরুগুলি | ৯ | ৩০ |
| গুরুলিকে | গরুগুলিকে | ৯ | ৩০ |
| ত্রাস | এসে | ১৯ | ৩০ |
| করিলেন | করলেন | ২১ | ৩০ |
| অন্যাহ্য | অন্যায্য | ২৮ | ৩০ |
| প্রচেষ্টা | তার প্রচেষ্টা | ২ | ৩১ |
| বাড়তে | বাড়াতে | ১০ | ৩১ |
| প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষক | ১৫ | ৩১ |
| বিবেচনার | বিবেচনায় | ২২ | ৩১ |
| বণাঢ্য | ধনাঢ্য | ১ | ৩২ |
| ঘটাল | ঘটান | ১০ | ৩২ |
| সর্বসামন্তিক্রমে | সর্বসম্মতিক্রমে | ১২ | ৩২ |
| সভাবসিদ্ধ | স্বভাবসিদ্ধ | ১২ | ৩২ |
| দিতে | দিতে হতো | ২৬ | ৩২ |
| অনুরোধ | অনুরোধে | ২৯ | ৩২ |
| সম্পূর্ণভাবে | [illegible] | [illegible] | ৩৩ |
| বাক্‌ভঙ্গীমা | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| নিসকলুষ | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| মুখে | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| অশুদ্ধ | শুদ্ধ | লাইন | পাতা |
|---|---|---|---|
| চতুর্থ পর্ব | | | |
| চেয়ার | চেয়ারে | ৫ | ৩৪ |
| নটভূমিতে | পটভূমিতে | ১০ | ৩৪ |
| ৈ রী | তৈরী | ১২ | ৩৪ |
| ব্যায়ে | ব্যয়ে | ৯ | ৩৫ |
| গুরুপ্রসাদ | গুরুপ্রসন্ন | ১০ | ৩৫ |
| প্রশংসনীয় | প্রশংসনীয় | ২০ | ৩৬ |
| প্রাস্তাব | প্রস্তাব | ৪ | ৩৬ |
| গটনের | গঠনের | ৬ | ৩৬ |
| সভার | সভায় | ২৬ | ৩৬ |
| উত্তরদায় | উত্তর দেয় | ৫ | ৩৭ |
| রজ্জু | রুজু | ২২ | ৩৭ |
| আনুসঙ্গিক | আনুষিঙ্গক | ১৬ | ৩৮ |
| জয়লাভ | জয়লাভে | ২০ | ৩৮ |
| লক্ষ্য | লক্ষ | ২৭ | ৩৮ |
| মুখানপক্ষিতা | মুখোপেক্ষিতা | ২৮ | ৩৮ |
| অজয় | অভয় | ১০ | ৪১ |
| ব্যয় | ব্যয়ে | ১৯ | ৪১ |
| কপক্ষেতৃ'পক্ষের | কর্তৃপক্ষের | ২১ | ৪১ |
| পালিত | পোলিও | ২১ | ৪২ |
| সতীশ পৈতণ্ডী | সতীপদ পৈতণ্ডী | ২১ | ৪২ |
| পৃথিবী | পৃথিবীতে | ৩ | ৪৩ |